আমি তো নামায পড়তে চাই কিন্তু .. !

লেখক ঃ
আব্দুর রাকীব (মাদানী)
লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব

বইর নামঃ আমি তো নামায পড়তে চাই কিন্তু .. !
লেখকঃ আব্দুর রাকীব (মাদানী)

প্রকাশকঃ আল্ উসওয়াহ্ আল্ হাসানাহ্ (আইডিয়্যাল) লাইব্রেরী ।
প্রকাশ কাল ঃ

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ লেখক নিজে ।

প্রপ্তিস্থানঃ আল্ উসওয়াহ্ আল্ হাসানাহ (আইডিয়্যাল) লাইব্রেরী ।
সমসিয়া মোড় , পোঃ নাহিট , ভায়াঃ কুশমন্ডি , জেলাঃ দক্ষিণ দিনাজপুর ,
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত ।

মূল্যঃ

" AMI TO NAMAJ PORTE CHAI KINTU .. ! "
written by : abdur raquib (madani)
published by : al uswah al hasanah (ideal) library.
Samsia mor. Po. Nahit. Ps. Kush mandi.
Dist. Dakshin dinajpur. W/b. India .

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নামাযের বর্ণনা

চতুর্থ অধ্যায়ঃ সুন্নত - নফলের বর্ণনা

পরিশিষ্ট

ooooooooooooooo

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد:

আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভাইকে নামায না পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতে শুনিঃ নামায তো পড়তে চাই কিন্তু ..অলসতার কারণে পড়িনা..সময় পাই না..সূরা জানি না..দোআ জানি না..আরবী পড়তে পারি না..হয়তঃবা কেউ মুখে না বললেও মনে মনে বলেঃ নামায পড়া জরুরী মনে করি না.. ইত্যাদি । নামায না পড়ার এসব ঠুনূক অজুহাতের সহজ সমাধানার্থে এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মুসলিম/মুসলিমা ভাই-বোনদের নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এই পুস্তকটি সংক্ষেপে লেখা হল। যদিও বাজারে, বাজারী বই-পুস্তকের ছড়াছড়ি কিন্তু সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে সংকলিত পবিত্রতা, অযু এবং নামাযের বিধিবিধান সম্পর্কীয় বই পুস্তকের যথেষ্ট অভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। আশা করি এ শুন্যতা পূরণে বইটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আল্লাহ তুমি কবূল কর । আমীন ।

বইটির কয়েকটি বৈশিষ্ট ঃ-

ক ঃ- সমস্ত তথ্য কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে বরাত সহ সংকলিত হয়েছে ।

খঃ- বরাত সমূহে হাদীসের বইগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যার বদলে অধ্যায় (কিতাব) এবং অনুচ্ছেদ (বাব) এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কারণ হাদীসের এ সব বই বিভিন্ন প্রেসে মুদ্রণের ফলে পৃষ্ঠা সংখ্যায় মতভেদ রয়েছে। তাই অধ্যায় এবং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে যেন পাঠক চাইলে সহজে খোঁজে বের করে উপকৃত হতে পারেন।

গ ঃ- আল্লাহ বলেনঃ (তুমি ঘটনা বর্ণনা কর, হয়তো তারা চিন্তা ভাবনা করবে) [আরাফ/১৭৬] এ মহা বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে হতেপারে কেউ হেদায়েত পাবেন।

ঙঃ- আরবী পড়তে জানেন না এরকম ভাইদের খেয়াল রেখে আরবী সূরা ও

দোআসমূহের বাংলা উচ্চারণ সহ অর্থ লেখা হয়েছে যেন সকল শ্রেণীর লোক উপকৃত হতে পারেন।
পরিশেষে আন্তরিকতার সাথে পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন রইল যে, মানুষ হিসাবে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই বিজ্ঞ মহল হতে গঠনমূলক সুপরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞতায় বাধিত হব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

ধপধপে সাদা কফন

প্রথম লাইনের প্রায় মাঝখানে ফাহীম.. প্যান্ট এবং শার্ট তার পরনে.. মাথায় হাত রুমাল পেঁচানো.. পিছনে আরো দুই তিনটি লাইন.. ক্লান্ততা বিষণ্ণতা তার চেহারায়..আসলে সে তার অতি আদরের মায়ের জানাযার নামায পড়ার জন্য সবার সাথে প্রথম লাইনে দাঁড়িয়েছে। জীবনে দুঃখ, অনেক সময় মানুষকে হিংস্র হানা দেয় কিন্তু.. মা জননীর মৃত্যু !! শুনেই কেমন যেন অন্তরে এক আতংকের সৃষ্টি হয়। আজ ফাহীমের তাই হয়েছে ..তার অন্তরে বেদনার যে কত ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছিল তা একমাত্র সেই অনুভব করছিল।
সে নিত্যান্ত পবিত্র মনে .. উদার মনে .. আদরের মায়ের জানাযার নামায পড়তে প্রস্তুত.. কিন্তু লাইনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে অতই বেশি অনুতপ্ত ও লজ্জিত বোধ করছিল.. কারণ.. আদরের মৃত মায়ের সম্মুখে সেও যেন এক জীবন্ত মৃত দেহ ! সে জানাযার নামায পড়তে জানে না .. কোন দিন পড়েও নি.. কারণ সে, গ্রামের বাইরে এমন সমাজে বড় হয়েছিল যেখানে কোন দিন জানাযা পড়ার সুযোগ তার ঘটেনি। সে কোন সূরা জানে না .. দোআ জানে না.. তার মন বলছিলঃ মায়ের জন্য মন উজাড় করে দোআ করব.. কিন্তু .. কি বলব ?
সে ডানে তাকায় বামে তাকায়.. সামনে ইমামকে দেখে.. ইমাম সাহেব কয়েকবার 'আল্লাহুআকবার' বলেন। লোকেরা ফিস ফিস করে কি যেন পড়তে থাকে.. তার নজর .. শেষ মেষ ধপধপে সাদা কফনে জড়ানো মা জননীর উপর থেমে যায়। চোখের কোল থেকে অশ্রু ধারা নিঝরে গাল বেয়ে ঝরতে থাকে। তার অন্তর যেন চিৎকার করে বলেঃ হায় অধম ফাহীম ! মা ইহজগৎ ছেড়ে চলে

গেল.. অথচ তাঁর জানাযার নামাযটুকু পড়ে বিদায় দিতে পারলি না.. দোআও করতে পারলি না.. তোমাকে ধিক! শত ধিক !!
প্রিয় পাঠক/পাঠিকা ! এ করুণ রহস্য কি শুধু ফাহীমের ? না আপনার এবং আমারও। আমাদের আপন কেউ মারা গেলে পারবো তো শুদ্ধ ভাবে জানাযার নামায পড়তে ? আল্লাহ না করুক যে সেরকম হউক। গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে বসবাস করে, এরকম অসংখ্য ভাইদের অবস্থাও কিন্তু আসলে অনুরূপ। তবে এরহস্য গোপনে। আসুন না এ করুণ রহস্যের অপসারণ করি, পড়তে আরম্ভ করি, জানতে শুরু করি।

মিউজিয়ামে নামায ! !

একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ড. আরীফীকে বলেনঃ একদা আমি সুইডেনের (ইউরোপের একটি দেশ) ভ্রমনে ছিলাম। সে দেশের দুই ভাইকে নিয়ে যাদুঘর দেখতে গেলাম..টিকিট নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই কিছুক্ষণের মধ্যে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল। দুইজনের একজন বললঃ মাওলানা ! মনে হয় এখন বাইরে যাওয়া ভাল হবে .. বাইরে নামায সেরে এসে বাকী দর্শণের কাজ পূর্ণ করব .. না কি বলেন ? আমি কৃত্রিম আশ্চার্যের কণ্ঠে বলিঃ কেন এখানে নামায পড়লে হয় না ?! সে বলেঃ এখানে ! এদের সামনে নামায পড়ব ?! না.. না এটা কঠিন ব্যাপার ! আমি বললামঃ কেন কঠিন ব্যাপার ?! সে বলেঃ মাওলানা ! আমরা এই সুইডেনদের সামনে নামায পড়ব ?! আমি বলিঃ হ্যাঁ ! সুইডেনদের সম্মুখে নামায আদায় করব .. অসুবিধা কি ? তুমি দেখতে পাচ্ছ না, ওরা যা ইচ্ছা তাই করছে.. আমাদের সামনে রোডের উপর .. প্রায় উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং লজ্জা বোধ করছে না!! তাদের কাজ-কর্মে তো লজ্জাও লজ্জিত হচ্ছে.. এবং ওরা দাবী করছেঃ এটা নাকি তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা.. আর আমরা অনেক ক্ষেত্রে হতভম্ব হয়ে তাদের এই স্বাধীনতা দেখছি ! তাই কেন না আমরা তাদের সামনে নামায আদায় করি.. এবং বলিঃ এটা আমাদের স্বাধীনতা।

আমার সাথী কষ্টে অনুমতি জানায়.. আমরা যাদুঘরের এক প্রান্তে স্থান নিই.. আমি কিবলামুখী হই.. এবং কানে আঙ্গুল রাখি.. এ দেখে আমার বন্ধু চিৎকার করে বলেঃ মাওলানা! এ আপনি কি করতে যাচ্ছেন ?! আমি ধীর কণ্ঠে তাকে বলিঃ আযান দিতে চাই.. সে অস্থিরতার সহিত বলেঃ আপনি এখানে আযান দিবেন ?! আমি বলিঃ হ্যা! এটা কি স্বাধীনতা নয় !.. তারা রাস্তা-ঘাটে গান করে, বাজনা বাজায় এবং সে সবকে স্বাধীনতা বলে !..

তুমিও বল এটা আমার স্বাধীনতা .. ফ্রী.. ফ্রীডম..!! অতঃপর আমি নিম্ন স্বরে আযান দিলাম.. একামত দিলাম..সবাই নামায পড়লাম.. বাকী দর্শন পূর্ণ করলাম। লোকেরা আমাদেরকে একত্রে নামায আদায় করতে দেখে.. তারা আমাদের রুকূ সিজদা করতে দেখে.. আমাদের তকবীর-তসবীহ শুনে। আমাদেরকে প্রশাসন বিভাগের কোন পুলিশ আটক করল না.. আমাদের উপর জরিমানাও হল না.. জেলেও নেওয়া হল না.. আকাশ ভেঙ্গে মটিতে পড়ল না।। [ইল্লা লি ইয়া'বুদূন, পৃ ৩-৪]

আমি ভাবিঃ তাদের তুলনায় আমাদের ঈমান কত দুর্বল ! সেটা তো বিদেশ.. ইউরোপ.. খৃষ্টানদের দেশ.. তার উপর আবার যাদুঘর ! আর আমরা তো নিজ দেশে.. নিজ দোকানে.. এমন কি নিজ ঘরে.. বসে থাকি.. পেপার পড়ি.. খবর শুনি.. টি.ভি.. দেখি.. আযানও শুনতে পাই.. কখনো দু চার জনকে রাস্তার পার্শে খোলা জায়গায় নামায পড়তেও দেখি.. কিন্তু আমরা যেন নামায পড়তে লজ্জা পাই.. আমরা এ ক্ষেত্রে লাজুক.. কি আশ্চার্য ধরণের আমাদের লজ্জা !! কি আশ্চার্য ধরণের আমাদের ঈমান!! বাহানা !

প্রিয় ভাই! এ নামায ফরয.. সর্বাবস্থায় জরূরী.. সুস্থ থাকুন কিংবা অসুস্থ.. নিজ গৃহে অবস্থান করুন বা সফরে..যুদ্ধাবস্থায় থাকুন বা শান্তিতে.. আল্লাহ এ নামায ফরয করেছেন।

তাই আসুন নামায সম্পাদনের নিয়ম-পদ্ধতি জানার পূর্বে কিছু আনুসাঙ্গিক জরূরী বিষয়ের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি। আল্লাহ তুমি আমাদের সুমতি দাও। আমীন !

প্রথম অধ্যায়ঃ পবিত্রতার বর্ণনা/ الباب الأول: الطهارة

নামাযের পূর্বে ঃ নামাযী ভাইকে নামাযের পূর্বে অযু করতে হবে এবং অযুর পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। তিনটি বিষয়ে পবিত্রতার খেয়াল রাখা আবশ্যিক কর্তব্য ঃ-

ক- শারীরিক পবিত্রতা।
খ- পোশাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা।
গ- নামায পড়ার স্থানের পবিত্রতা।

ক— শারীরিক পবিত্রতা

মুসলিম ব্যক্তি সাধারনতঃ পাক। তবে তার দৈহিক বা শারীরিক অপবিত্রতা দুই প্রকারের ঃ

১- ছোট অপবিত্রতা (ছোট নাপাকী)।
২- বড় অপবিত্রতা (বড় নাপাকী)।

১— ছোট নাপাকীর বর্ণনা ঃ—

ছোট নাপাকী বলতে এমন নাপাক অবস্থাকে বুঝায়, যা কেবল অযু করলে দুর হয়ে যায়। যেমন পেশাব পায়খানা করা, বায়ু নির্গত হওয়া, অসুখের কারণে প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে অন্য কিছু বের হওয়া, ঘুম যাওয়া, অজ্ঞান হওয়া এবং উটের মাংস খাওয়া। এসবের কোন একটি ঘটলে ছোট নাপাকীর অবস্থা বুঝায় এবং শুধু অযু করলে পবিত্র হওয়া যায়।

২- বড় নাপাকীর বর্ণনা ঃ—

বড় নাপাকী এমন অপবিত্র অবস্থাকে বুঝায়, যা অযু দ্বারা দূরীভূত হয়না বরং ব্যক্তির উপর গোসল জরুরী হয়। নিম্নে বর্ণিত যে কোন একটি কারণে গোসল করা জরুরী হয়।

ক- যে কোন কারণেই হোক না কেন, ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া।(১) [এরকম নম্বর অর্থাৎঃ তথ্যের বরাত যা, নিম্নে ছোট অক্ষরে দাগের পর দেয়া হয়েছে]

খ- সহবাস করা, যদিও বীর্যপাত না হয়। [বুখারী, অধ্যায়ঃগোসল, হাদীস নং ২৯১]

গ- হায়েয বা মাসিক স্রাব শেষ হলে। প্রকাশ থাকে যে, স্রাব শুরু হলে

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু, হাদীস নং ১৭৮-এবং অধ্যায়ঃ গোসল, হাদীস নং ২৮২।

গোসল জরূরী হয় না বরং যখন স্রাবের নির্ধারিত সময় শেষ হয়, তখন গোসল জরূরী হয়।(১)

ঘ- নেফাস বা সন্তান প্রসব শেষে। উল্লেখ থাকে যে, সন্তান প্রসব শেষে যে রক্তক্ষরণ হয়, সে সময় নামায পড়া নিষেধ। এর উর্দ্ধসীমা ৪০/চল্লিশ দিন। চল্লিশ দিনের পূর্বে স্রাব বন্দ হলে গোসল করে নামায আরাম্ভ করতে হবে।(২)

নাপাক ব্যক্তির উপরে যা করা নিষেধ

১- নামায পড়া। [সূরা মায়েদাহ/ ৬]

২- মসজিদে অবস্থান করা। (৩)

৩- কাবা শরীফের তাওয়াফ করা। (৪)

৪- কুরআন মজীদ পড়া এবং স্পর্শ করা। বড় নাপাকী হলে। (৫)

প্রকাশ থাকে যে, ছোট নাপাকী হলে কুরআন মজীদ স্পর্শ না করেই মুখস্ত পড়া বৈধ। (৬)

গোসলের বিধান/ أحكام الغسل

বড় নাপাকী হলে গোসল জরূরী হয়। আল্লাহ বলেনঃ (যদি তোমরা অপবিত্র থাক তাহলে বিশেষ ভাবে পবিত্র হাসিল কর।) [মায়েদাহ/ ৬]

* গোসল হলঃ পবিত্রতার উদ্দেশ্যে সারা শরীর পূর্ণ রূপে পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা। এতটুকু হলেই গোসল হয়ে যায় তবে উত্তম এবং সুন্নতী পদ্ধতিতে গোসলের নিয়ম নিম্নরূপ ঃ-

* প্রথমে অন্তরে বড় নাপাকী হতে পবিত্রতার (নিয়ত) ইচ্ছা করা।

* অতঃপর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

* অতঃপর বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করা।

---

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ হায়েয, হাদীস নং ৩০৬।

(২) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ নং ১০৫ হাদীস নং ১৩৯।

(৩) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা হাদীস নং ২৩২।

(৪) তিরমিযী, দারাকুত্বনী।

(৫) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, হাদীস নং ১৩১- সূরা ওয়াকিয়াহ/ ৭৯।

(৬) তিরমিযী,অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ ব্যক্তি জুনুবী না হলে সবসময় কুরআন পড়বে। হাদীস নং ১৪২।

সাথে সাথে নোংরাযুক্ত স্থান ধুয়ে ফেলা।

* অতঃপর ' বিসমিল্লাহ ' বলে নামাযের মত অযু করা।

* তারপর তিন অঞ্জলি পানি দ্বারা মাথার চুলসমূহ ভালভাবে ধৌত করা।

* তারপর সারা শরীর ধৌত করা।

আয়েশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যখন নবী (সাঃ) জানাবাতের (বড় নাপাকীর) গোসল করতেন তখন, " প্রথমে দুই হাত ধুতেন। তার পর অযু করতেন যেমন নামাযের জন্য অযু করা হয়। তার পর পানি দ্বারা মাথার চুলের খিলাল করতেন। তার পর মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন"। [বুখারী, অধ্যায়ঃ গোসল, হাদীস নং ২৪৮] অন্য বর্ণনায় প্রথমে দুই হাত ধোয়ার পর লজ্জাস্থান ধৌত করার বর্ণনা এসেছে। [ঐ নং ২৫৭]

খঃ— পোশাক পরিচ্ছদের পবিত্রতা

পোশাক পাক থাকা বলতে বুঝায় যে, যে কাপড় পরিধান করে নামায পড়া হবে তা যেন পেশাব পায়খানা হতে মুক্ত হয়। [আহমদ, ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৫৪২] উল্লেখ থাকে যে, যদি কেউ অজান্তে নোংরাযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়ে নেয় তাহলে তার নামায হয়ে যাবে, পুনরায় আর পড়তে হবে না। [আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, হাদীস নং ৬৫০]

গঃ— নামাযের স্থানের পবিত্রতা

যে স্থানে নামায পড়া হবে তাও যেন পেশাব- পায়খানা হতে পাক হয়। নবী (সাঃ) এর মসজিদে এক অজ্ঞ ব্যক্তি পেশাব করে দিলে, নবীজী সাহাবাদের পানি দ্বারা সেই স্থান ধুয়ে দিতে বলেন। [বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু হাদীস নং ২২০]

* ছাগল বাধার স্থানে নামায পড়া জায়েয। [তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, নং ৩৪৬]

* গোবর এবং মাটি মিশ্রিত লেপনের উপরে নামায আদায় করা সিদ্ধ। কারণ স্থান শুকিয়ে গেলে তা পবিত্র হিসাবে গন্য হয়। তাছাড়া হালাল পশুর মল-মূত্র অনেক আলেম উলামা পাক বলেছেন। [ফিকহুস্ সুন্নাহ-১/ ২০-২১]

****

পানির বর্ণনা/ أحكام المياه

পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেহেতু পানিই আসল সেহেতু এ সম্বন্ধে কিছু জানা একান্ত দরকার।

* সাধারনতঃ সব পানিই পাক এবং তা দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করাও বৈধ। যেমন আকাশের পানি, সাগর-নদীর পানি, পুকুরের পানি, খাল-বিলের পানি, নলকুপের পানি ইত্যাদি। এ সব পানির পরিমাণ কমই হোক বা বেশি হোক। তবে পানিতে নাপাক যিনিস পড়ার কারণে বা মিশ্রণের কারণে যদি পানির রং, স্বাদ এবং ঘ্রাণ বদলে যায় তাহলে সে পানি নাপাক হয়ে যায়। উক্ত পানির পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক। (১) তবে পানিতে যদি পাক যিনিসের মিশ্রণ হয় যেমন, সাবান, আটা, কফুর, চিনি, লবন ইত্যাদি এবং মিশ্রিত বস্তুর পরিমাণ কম হয় তাহলে সে পানি পবিত্র বলে গণ্য হবে এবং তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাও জায়েয হবে। মিশ্রিত বস্তুর পরিমাণ যদি বেশি হয় এবং বেশি হওয়ার ফলে যদি পানি স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং অন্য নাম পড়ে যায়। যেমন পানিতে বেশি চিনি মিশ্রিত হলে তাকে আর পানি বলা হয় না, তা হয় সরবত। অনুরূপ লবন পানি, স্লাইনের পানি। তাহলে এ ধরণের পানি পাক তবে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। ফিকহুস সুন্নাহ, প্রথম খন্ড, পৃ ১৪]

****

(১) ইবনু মাজাহ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা/ দারাকুতনী / ইজমা, ইবনুল মুনযির, নং ১০।

চৌবাচ্চায় ইংরেজ

দিল্লীর ঐতিহাসিক জামা মসজিদের বারান্দায় বসে মসজিদের চারি পার্শের দৃশ্য অবলকন করছিলাম। প্রশস্ত অঙ্গন.. চারি দিকের গেটে মুগল যুগের অপরূপ কারু-কার্জ..। পায়রার ঝাঁক উড়ে উড়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে.. উঠন খুঁটে খাচ্ছে। মধ্য অঙ্গনে অযু করার একটি হাওয.. চৌবাচ্চা। গোল হয়ে মুসল্লীরা.. ভ্রমনে আসা লোকেরা.. অযু করে মসজিদে প্রবেশ করছে। সেই চৌবাচ্চার এক প্রান্তে এক ইংরেজ। সেও অন্যান্য অযুকারী মুসলিম ভাই বোনদের দিকে তাকাচ্ছে এবং অযু করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। প্রথমে অর্ধ হাত ধৌত করল.. তারপর মুখ..তার পর পা। লোকেরা মাথা এবং কানের মাসেহ করছিল। হয়তঃ সে তা ভাল করে বুঝতে পারছিল না যে, এরা আবার চুল এবং কান কেন স্পর্শ করছে ? সে না বুঝতে পেরে মাসেহর কাজটি শেষে ছেড়েই দিল। উঠে ভিতরে প্রবেশ করল।

আমি ভাবিঃ আল্লাহ এবং রাসূলের দেওয়া পরিচ্ছন্নতার এ বিধান কত সুন্দর ! কত মুগ্ধকর ! অমুসলিমও কৃত্রিম অযু করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এমন নামধারী কতই না মুসলিম ভাই বোন আছে যারাও কিন্তু অযু করতে জানে না .. জানে না অযুর দুআটি !!

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ অযু, মাসাহ্ এবং তায়াম্মুম

الباب الثاني: في بيان أحكام الوضوء والمسح والتيمم

অযুর পদ্ধতি ঃ-

* মুসলিম ভাইকে অযু শুরু করার পূর্বে অন্তরে অযুর নিয়ত (ইচ্ছা) করতে হবে। [বুখারী প্রথম হাদীস] অর্থাৎঃ খেলা ধুলা বা হাতে নোংরা লাগলে মানুষ যেমন বিনা কোন নিয়তে হাত পা ধৌত করে তেমন যেন না হয় বরং মনে অযু করার ইচ্ছা থাকতে হবে।

* তার পর বিসমিল্লাহ বলতে হবে। (১) যদি কেউ বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তো, অযু হয়ে যাবে। পুনরায় আর করতে হবে না। (২)

(১) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, হাদীস নং ১০১।
(২) ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ ত্বালাক, অনুচ্ছেদঃ জোরপূর্বক এবং ভুলক্রমে তালাক।

* অতঃপর পানি দ্বারা দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধুতে হবে। (১)
* তার পর কুল্লি করতে হবে। (২) কুল্লি করার নিয়ম হল, মুখের ভিতরে পানি নিয়ে তা, ভালভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া।
* অতঃপর হাতে পানি নিয়ে তা নাকের ভিতর টেনে নিয়ে বাইরে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। (৩) তবে রোযা অবস্থায় নাকের ভিতর পানি না টেনে সাধারণ ভাবে পরিষ্কার করতে হবে। (৪)
* অতঃপর মুখমন্ডল ধুতে হবে। [সূরা মায়েদাহ / ৬] মুখমন্ডল বা চেহারার সীমা হচ্ছে ; কপালের উপরে যেখানে মাথার চুলের শুরু সেখান থেকে নিম্নের দিকে থুৎনীর নিচ পর্যন্ত। প্রস্তের দিকে ; এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত। এই সময় দাড়ির খিলাল করে নেওয়া ভাল। কারণ নবী (সাঃ) দাড়ির খিলাল করতেন। (৫)
* অতঃপর পূর্ণ দুই হাত কুনুই সমেত ধুতে হবে। [মায়েদাহ / ৬]
* অতঃপর এক বার মাথার মাসেহ করতে হবে। (৬) মাসেহ করার নিয়ম হলঃ পানিতে হাত ভিজিয়ে নিয়ে দুই হাতের ভিজা আংগুলগুলি মাথার সামনে হতে পিছনে, একই সাথে পিছন হতে সামনে, চুলের উপর বুলিয়ে নেওয়া। (৭)
* মাথার মাসেহ শেষে সেই হাতের তর্জনী এবং বুড়ো আংগুল দ্বারা একবার কানের মাসেহ্ করতে হবে। কানের মাসেহর নিয়ম হলঃ তর্জনী (শাহাদত) আংগুল দ্বারা কানের ভিতরের অংশ এবং বুড়ো আংগুল দ্বারা বাইরের অংশ মুছে নেওয়া।
* অতঃপর গিঁট সহ প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ধুতে হবে।(৮)

---

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু। (২) বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু, হাদীস নং ১৬৪।
(৩) বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু, হাদীস নং ১৬৪।
(৪) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, হাদীস নং ১৪২।
(৫) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, নং ১৪৫। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেন।
(৬) বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু , নং ১৯২। (৭) ঐ।
(৭) আবুদাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, হাদীস নং ১০৮। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেন।
(৮) সূরা মায়েদাহ, আয়াত নং ৬।

অযু শেষে দোআ ঃ- অতঃপর পড়ুন নিম্নের দুআটি।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণঃ- " আশ্‌হাদু আন্‌ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু, ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌ দুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লা- হুম্মাজ্‌ আল্‌নী মিনাত্‌ তাউআবীনা ওয়াজ্‌ আল্‌নী মিনাল্‌ মুতা ত্বাহ্‌ হিরীন"।

অর্থঃ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক ও শরীক বিহীন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। (১) হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন!! (২)

অযু সম্পর্কে আরো কিছু জ্ঞাতব্য ঃ-

* যে ভাবে অযু করার পদ্ধতি বর্ণিত হল অনুরূপ ধারাবাহিকভাবে একের পর এক কাজ বিরতি ছাড়াই সম্পাদন করতে হবে। উল্টা পাল্টা করে করলে অযু হবে না। [মায়েদাহ, আয়াত নং ৬]

* অযুর অঙ্গগুলি ডান দিক থেকে ধৌত করা সুন্নত।

* নবীজী বেশিরভাগ সময়, অযুর অঙ্গগুলি তিন বার করে ধুতেন। কোন কোন সময় দুই দুই বার এবং এক এক বারও ধুতেন। কোন অঙ্গ এক বার আর অন্যটি দুই বার বা তিন বার, এরকম হলেও অযু হয়ে যায়। [দেখুন, বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু]

* মাথা মাসেহ করার সময় গর্দান (ঘাড়) মাসেহ করার কোন সহীহ্‌ প্রমাণ নেই তাই তা পরিত্যাজ্য। (৩)

অযু ভঙ্গের কারণ সমূহ ঃ- نواقض الوضوء

১- পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে অযু ভেঙ্গে যায়। যেমন; প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু, বীর্য, স্রাব ইত্যাদি। (৪)

২- যে কোন কারণে জ্ঞান শূন্য হলে অযু নষ্ট হয়ে যায়। যেমন; ঘুম বা কোন কারণে বেহুশ হওয়া। তবে হাল্কা নিদ্রা যেমন তন্দ্রা আসলে অযু নষ্ট -

(১) মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা অর্জন, অনুচ্ছেদঃ অযু শেষে মুস্তাহাব যিক্‌র।
(২) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ অযু শেষে যা বলতে হয়।
(৩) আর্‌ রাওযা আন্নাদীয়্যাহ ১/১২৮। (৪) বুখারী, হাদীস নং ৬৯৫৪।

হয় না। (১)

৩- অন্তরায় ছাড়া লজ্জাস্থান (পায়ু দ্বার বা লিঙ্গ) স্পর্শ করা। (২)

৪- উঁটের মাংস খাওয়া। (৩) উল্লেখ থাকে যে, উঁটের মাংস খেলে অযু কেন নষ্ট হয় ? কারণ নবীজী উল্লেখ করেন নি।

* এছাড়াও কিছু কারণ আছে যা, অনেকের নিকট অযু ভঙ্গের কারণ আর অনেকের নিকট না। যেমন যৌন চেতনার সাথে স্ত্রীকে স্পর্শ করা, বমি করা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, মাইয়েতকে গোসল দেওয়া। এ সবের পক্ষে বর্ণিত দলীলাদি বলিষ্ঠ এবং নির্ভেজাল নয় বলে তা অযু ভঙ্গের কারণ হিসাবে গণ্য করা হল না।

চপ্পলের আওয়াজ

নবীজীর মসজিদের মুআযযিন বেলাল (রাযিঃ)। কতই সৌভাগ্যবান। একদা ফজরের নামাযের সময় নবীজী তাকে বলেনঃ বেলাল ! তোমার এমন এক আমলের সম্পর্কে আমাকে বল যা, আল্লাহর দরবারে কবূল হওয়ার ব্যাপারে তুমি সবচেয়ে বেশি আশাবাদী। হঠাৎ এরকম প্রশ্ন কেন ? বেলালের জানতে ইচ্ছে হয়। নবীজী নিজেই প্রশ্নের কারণ বর্ণনা করেন। বলেনঃ " জান্নাতে তোমার চপ্পলের আওয়াজ শুনতে পেলাম"। পৃথিবীর যে কোন অমূল্য সম্পদ, যে কোন ম্যাডেল থেকে এই কথাটি তার কাছে.. সব চেয়ে প্রিয়.. সব চেয়ে দামী। পৃথিবীতেই জান্নাতের এ মহা সুসংবাদ ! নবীজীও কম ভালবাসেন না ! তার জুতার শব্দকেও চেনেন !!

বেলাল বলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি দিন কিংবা রাতে, যখনে অযু করি, নামায আদায় করি, যতখানি পারি। [বুখারী, তাহাজ্জুদ, নং ১১৪৯]

জান্নাতের সুসংবাদ কি এমনি এমনি ! তিনি নফল ইবাদতটিও কত যত্নের সাথে পালন করেন। আমাদের তো ফরযের হালও বেহাল।

---

(১) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ত্বাহারাহ, অনুচ্ছেদঃ ঘুমের কারণে অযু করা।

(২) নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, অধ্যায়ঃ ত্বাহারাহ। শাঈখ আলবানী সহীহ্ বলেন।

(৩) মুসলিম, অধ্যায়ঃ হায়েয, অনুচ্ছেদঃ উঁটের মাংস ভক্ষণে অযু। হাদীস নং ৮০০।

মাসাহ্ এর বর্ণনা / أحكام المسح

মোজার উপর মাসাহ্ ঃ- ইসলাম সহজ সরল ধর্ম। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কষ্ট চান না। তাই অধিক কষ্টের সময় সহজ বিধান দেন। সেই সহজ বিধানগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে ; মোজা পরিধানকারী ব্যক্তি অযু করার সময় মোজা না খুলেই তার উপর মাসাহ করতে পারে।

* মোজার উপর মাসাহ করা একটি প্রসিদ্ধ বিধান যা, প্রচুর হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম আহমদ বলেনঃ ' এ বিষয়ে সাহাবাবৃন্দ হতে ৪০ টি মারফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে'। [নায়লুল্ আউত্বার, ১/২৩২]

* চামড়ার মোজা, উলের মোজা, সুতি মোজা সব প্রকারের মোজার উপর মাসাহ জায়েয। কারণ এসবকে মোজা বলা হয় এবং নবীজী বিনা পার্থক্যে মোজার উপর মাসাহ্ জায়েয করেছেন। শুধু যুগের পরিবর্তনে তৈরীর সামগ্রী ভিন্ন হয়েছে মাত্র।

মাসাহ্ র সময় সীমাঃ- মুকীম (স্বীয় বাসস্থানে অবস্থানকারী) ব্যক্তি একদিন এক রাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত অযুর সময় পা না ধুয়ে মাসাহ করতে পারে। (১)

* মোজা পরার পর প্রথম অযু ভঙ্গের সময় থেকে মাসাহ করার সময় শুরু হয়। (২)

মাসাহ্ করার নিয়মঃ- পানিতে হাত ভিজিয়ে নিয়ে, ভেজা আংগুলগুলো পায়ের আংগুলগুলির উপর রেখে উপরের দিকে এমন ভাবে টানা যেন, মোজার অধিকাংশ স্থানে আংগুলগুলি স্পর্শ করে। (৩)

* মাসাহ, মোজার নিচের অংশে বা পেছনের অংশে করতে হয় না। (৪)

মোজার উপর মাসাহ্ করার শর্তাবলীঃ- কয়েকটি শর্তে মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয। যদি এই শর্তগুলি না থাকে তাহলে মাসাহ্ জায়েয হবে না।

১- মোজা এমন হতে হবে যা, পবিত্র অবস্থায় (অযু অবস্থায়) পরা হয়েছে। বিনা অযুতে মোজা পরলে সেই মোজাতে মাসাহ্ হবে না। [বুখারী,অযু,নং২০৬]

---

(১) মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসাহ করারর সময় সীমা। নং ৬৩৭
(২) আল্ মুলাখ্খাস আল্ ফিক্হী, ১/৪১। (৩) আল্ মুলাখ্খাস আল্ ফিক্হী, ১/৪৩।
(৪) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ত্বাহারাহ হাদীস নং ১৬২। আলবানী (রাহেঃ) সহীহ বলেন।

২- মোজা পাক হতে হবে, নাপাক মোজায় মাসাহ হবে না। অনুরূপ পবিত্র বস্তু দ্বারা তৈরী হতে হবে।

৩- এমন মোজা হতে হবে যা দ্বারা গিঁট ঢাকা থাকে। অর্থাৎঃ অযুর সময় পায়ের যতটুকু স্থান ধুতে হয়, ততটুকু অবশ্যই যেন ঢাকা থাকে। (১)

* মোজা সামান্য ছেঁড়া থাকলে মাসাহ বৈধ হবে। (২)

* মুকীম ও মুসাফিরের নির্ধারিত সময় সীমা শেষ হয়ে গেলে কিংবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোজা খুলে ফেললে বা খুলে গেলে কিংবা বড়নাপাকী হলে, আর সেই মোজায় মাসাহ হবে না। (৩)

পট্টি বা বেন্ডেজের উপর মাসাহ ঃ-

অসুস্থতার কারণে শরীরের যে কোন ক্ষত স্থানে পট্টি বা বেন্ডেজ জাতীয় কোন কিছু থাকলে, অযু এবং ফরয গোসলের সময় তার উপর মাসাহ করাই যথেষ্ট হবে। যত দিনে আরোগ্য লাভ না হয়। এক্ষেত্রে কোন সময় সীমা নির্ধারিত নেই। (৪)

এ কি আকাঙ্খা !!

এক নামাযী ব্যক্তি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে.. অন্য এক ভাই তার সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে যায়.. দেখে.. কি করুন দৃশ্য ! মাথা ছাড়া শরীরের কোন অঙ্গই নড়ছে না.. সব অবস..সে তার অবস্থা দেখে.. মনে রহম আসে..সে রোগীকে বলেঃ ভাই তোমার আশা কি ? তোমার আকাঙ্খা কি ? রোগী বলেঃ আমার বয়স প্রায় চল্লিশ.. আমার পাঁচ জন সন্তান আছে.. আর আমি এই অসুস্থের খাটে সাত বছর ধরে পড়ে আছি.. আল্লাহর কসম! আমি এ খাট থেকে উঠে চলা-ফেরা করি.. এ আশা আমার নেই.. ছেলে-পেলেদের ও দেখতে চাই না.. আর না অন্যান্য মানুষের মত জীবন যাপন করার আকাঙ্খা আমার মনে.. আমার আশাঃ যদি এই কপালকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেএকটু মাটিতে ঠেকাতে পারতাম.. অন্যদের মত সিজদা করতে পারতাম !! হে সুসাস্থের অধিকারী ! আপনি নামায আদায় করেন তো.. কপাল মাটিতে ঠেকান তো ?।

(১) মুলাখ্খাস আল্ ফিক্হী, ১/৪১-৪২। (২) আল্ মুগনী, ১/৩৭৬।
(৩) ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ ঘুমের কারণে অযু। আলবানী হাসান বলেন।
(৪) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ আহত তায়াম্মুম করবে। আলবানী হাসান বলেন।

তায়াম্মুমের বিধান / أحكام التيمم

মুশকিলে আসান '। বান্দা অসুবিধায় পড়লে আল্লাহ সহজ বিধান দ্বারা মুশকিল দুর করেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'তায়াম্মুম'। মুসলিম ব্যক্তি ছোট নাপাকী বা বড় নাপাকী থেকে পবিত্রতা হাসেল করার সময় পানি না পেলে বা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আসংকা থাকলে, পানির পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা বিশেষ পদ্ধতিতে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। একেই তায়াম্মুম বলে।
আল্লাহ বলেনঃ (.. যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা হতে আসে কিংবা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর পানি না পায় তবে সে যেন পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়, তখন তোমরা তা দ্বারা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করবে।) [সূরা মায়েদাহ/৬]

তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ-

* পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ' বিসমিল্লাহ' বলে দুই হাত পবিত্র মাটিতে ঘেষে নিয়ে এবং তাতে ফুঁ দিয়ে প্রথমে মুখমন্ডল তার পর দুই হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করা। (মুখমন্ডল এবং দুই হাতের উপর ধুলাযুক্ত হাত বুলিয়ে নেওয়া) এই ভাবে নবীজী সাহাবী আম্মার (রাযিঃ) কে তায়াম্মুম করা শেখান। (১)

* অযু করার পর যে সব কাজ বৈধ হয় যেমনঃ নামায পড়া, কুরআন পড়া, তেমন তায়াম্মুম করলে সে সমস্ত কাজ করা যায়। যে যে কারণে অযু নষ্ট হয়, সে সে কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়। (২) প্রয়োজনে দীর্ঘ দিন যাবত তায়াম্মুম করা যায়। (৩)

প্রকৃতিগত সুন্নত (ফিত্বরাতী সুন্নত)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ পাঁচটি বিষয় স্বভাবগতঃ (১) খতনা করা। (২) গুপ্ত অঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। (৩) মোচ ছোট করা এবং দাড়ি বড় করা। (৪) নোখ কাটা। (৫) বগলের লোম ছেঁড়ে ফেলা। (৪) এই কয়েকটি কাজ প্রকৃতিগত সুন্নত হিসাবে প্রমাণিত যা, সমস্ত মানুষকে পালন করা উচিৎ। বিগত নবীগণের উম্মতের প্রতিও তা করনীয় ছিল এবং

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ তায়াম্মুম, হাদীস নং ৩৩৮।
(২) ফিক্বহুস্ সুন্নাহ, ১/৫৯। (৩) আহমদ, তিরমিযী।
(৪) বুখারী, অধ্যায়ঃ লেবাস, অনুচ্ছেদঃ নোখ কর্তন, হাদীস নং ৫৮৯১।

আমাদের প্রতিও তা বহাল আছে।

পেশাব পায়খানার আদব / آداب قضاء الحاجة

* শৌচালয় থাকলে শৌচালয়ে নচেৎ দুরে, মানুষের চোখের আড়ালে প্রস্রাব পায়খানা করতে হয়। (১)

* পেশাব পায়খানার সময় কিবলাকে (কাবা শরীফকে) যেন সামনে বা পেছনে না করা হয়। (২) আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মানুষ যেন পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে শৌচ কাজ না করে।

* টয়লেটে বা আড় আছে এমন স্থানে পেশাব পায়খানা করার সময় কিবলা সামনে বা পেছনে করা জায়েয আছে। (৩)

* শৌচ কাজ বা শৌচালয়ে প্রবেশের পূর্বে নিম্নোক্ত দোআ পড়তে হয়।
" আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ খুবসে ওয়াল্ খাবাইস"। অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (৪)

* টয়লেট থেকে বের হয়ে পড়ুন " গুফ্ রানাকা"। অর্থঃ হে আল্লাহ আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (৫)

* বিশেষ কোন কারণ ছাড়া দাঁড়িয়ে শৌচকার্য করা নিষেধ। (৬)

* পেশাব-পায়খানা হতে ভালভাবে পরিষ্কার হওয়া জরূরী। পানি না পাওয়া গেলে ঢিল, টিসু , কাপড়, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা তিনবার পবিত্রতা হাসিল করতে হবে। শুকনো গোবর বা হাড় দ্বারা কুলুখ করা নিষেধ। (৭)

* পবিত্রতার নামে লজ্জাস্থানের সাথে ঢিল বা অন্য কিছু চেপে ধরে চল্লিশ কদম হাটাহাটি করা বা বিভিন্ন রকমের শব্দ বের করা এবং বিশেষ ভাবে নড়াচড়া করার শরীয়তে কোন ভিত্তি নেই। তাছাড়া এটি বেহায়াপনাও বটে। এরকম চরিত্র নবীজীর কখনই ছিলনা।

****

(১) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা নং ১। (২) বুখারী, অধ্যায়ঃ নামায, হাদীস নং ৩৯৪।
(৩) বুখারী, অধ্যায়ঃ অযু, হাদীস নং ১৪৫- আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ত্বাহারাহ নং ১৩।
(৪) বুখারী, অধ্যায়ঃ নামায, নং ১৪২-/ মুসলিম। (৫) আবুদাউদ, অধ্যায়ঃ ত্বাহারাহ।
(৬) ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ ত্বাহারাহ। (৭) মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত।

সুস্থ রোগী !!!

মুহাম্মদ বিন খফীফ রাহেমাহুল্লাহের কমরে চরম ব্যথা ছিল .. ব্যথার প্রবলতার কারণে কোন কোন সময় নড়া-চড়া করতে পারতেন না ..। আযান হলে .. এক ব্যক্তির পিঠে চেপে মসজিদে উপস্থিত হতেন .. তাঁকে একবার বলা হলঃ আপনার তো অযর আছে .. আপনি মসজিদে যেতে অক্ষম এরকম ক্ষেত্রে আপনার প্রতি মসজিদে আসা তো জরূরী নয় .. বাড়িতেই নামায পড়ে নিতে পারেন .. নিজের নফসকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন ? তিনি বলেনঃ না .. কখনও না.. যদি মুআয্ যিনকে বলতে শোন .. হাইয়া আলাস্ সালাহ .. নামাযে আসো .. আর আমাকে মসজিদে না পাও .. তাহলে আমাকে কবরস্থানে খোঁজ করিও .. জেনে নিও .. আমি মৃত ..!

হায় ! আসলে তিনি অসুস্থ নোন .. আমরাই অসুস্থ .. বলতে গেলে, আমরা রোগী .. কিন্তু সুস্থ-রোগী ..!! [.. ইল্লা লিইয়াবুদূন,৭৯]

আযান ও ইকামত / الأذان والإقامة

* আযান হচ্ছে, বিশেষ কিছু শব্দ দ্বারা নামাযের জন্য আহবান করা।
* নামাযের সময় হলে মানুষ কম হোক বা বেশি একজন যেন অবশ্যই আযান দেয়। (১) [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৬৩১]

আযানের পদ্ধতি এবং শব্দসমূহ ঃ- আযানের বাক্যগুলি উচৈঃস্বরে টেনে টেনে দিতে হয়। নিম্নে উহা বর্ণিত হল।

আল্লা-হু আক্বার-আল্লা-হু আক্বার। (আল্লাহ সবচেয়ে বড়-আল্লাহ সব চেয়ে বড়।)
আল্লা-হু আক্বার- আল্লা-হু আক্বার। (আল্লাহ সবচেয়ে বড়-আল্লাহ সব চেয়ে বড়।)
আশ্হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।)
আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ।(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।)
আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসূলুল্লা-হ। (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।)
আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসূলুল্লা-হ। (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।)
হাইয়া আলাস্ স্বালা-হ। (নামাযের জন্য আসো।)
হাইয়া আলাস্ স্বালা-হ। (নামাযের জন্য আসো।)

হাইয়া লাল্ ফালা-হ। (কল্যাণের জন্য আসো।)
হাইয়া লাল্ ফালা-হ। (কল্যাণের জন্য আসো।)
আল্লা-হু আক্ বার- আল্লাহু আক্ বার। (আল্লাহ সবচেয়ে বড়- আল্লাহ সবচেয়ে বড়।)
লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই।)
[আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ আযান কিরূপ হবে।]
* ফজরের আযানের সময় হাইয়া আলাল ফালা-হ বলার পর দুই বার বলতে হবে ' আস্ স্বালাতু খায়রুম্ মিনান্ নাউম ' (ঘুম হতে নামায উত্তম) [ঐ]

ইকামতের পদ্ধতি ঃ- আনাস (রাযিঃ) বলেনঃ বেলাল (রাযিঃ) কে জোড়া জোড়া শব্দে আযান এবং বে জোড় শব্দে ইকামত দিতে আদেশ করা হয়েছিল, 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ স্বালা-হ' বাক্য ব্যতীত। (১)
উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী ইকামতের বাক্যগুলি হবে নিম্নরূপঃ
আল্লা-হু আক্ বার - আল্লা-হু আক্ বার।
আশহাদু আল্ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ।
হাইয়া আলাস্ স্বালা-হ। হাইয়া আলাল্ ফালা-হ।
ক্বাদ্ ক্বা-মাতিস্ স্বালা-হ , ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ স্বালা-হ।
আল্লা-হু আক্ বার, আল্লা-হু আক্ বার।
লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। (২)
* উল্লেখ থাকে যে, আযানের অনুরূপ ইকামত দেয়ার বিষয়ে তিরমিযীতে একটি হাদীস এসেছে কিন্তু হাদীসটি দুর্বল। তাই বেজোড় ইকামতের পদ্ধতিই বেশি সঠিক যা বুখারী সহ অন্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (৩)
* আযান শ্রবণকারীদের মুআয্যিনের অনুরূপ বাক্যগুলি রিপিট করতে হবে। তবে হাইয়া আলাস্ স্বালা-হ এবং হাইয়া আলাল্ ফালা-হ এর স্থানে লা- হাওলা ওয়ালা- কুও আতা ইল্লা- বিল্লা-হ, (নেই কোন শক্তি নেই কোন সামর্থ আল্লাহ ব্যতীত) বলতে হবে। (৪)

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৬০৫।
(২) আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ আযান কিরূপ হবে।
(৩) বিস্তারিত দেখুন, তুহ্ ফাতুল্ আহওয়াযী, ১ম খন্ড পৃঃ ৪৯৪-৪৯৯।
(৪) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৬১১,৬১৩।

আযানের দোআঃ- আযান শেষ হলে প্রথমে দরূদ পড়ুন। [মুসলিম]
অতঃপর পড়ুনঃ " আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাহ, ওয়াস্ স্বালা-তিল্ ক্বায়েমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা, ওয়াল্ ফাযীলাহ, ওয়াব্ আস্হু মাক্বামাম্ মাহ্মূদা, আল্লাযী ওয়াদ্ তাহ্ "।
অর্থঃ " হে আল্লাহ ! এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমি প্রভু। মুহাম্মদ (সাঃ) কে দান কর 'অসীলা' (জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত স্থান) মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে প্রশংসিত স্থান 'মাকামে মাহমূদে' যার অঙ্গিকার তুমি করেছ"। [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৬১৪]
* নবীজী বলেনঃ আযান শুনে যে ব্যক্তি এই দুআ পড়বে সে কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআতে ধন্য হবে। [বুখারী, আযান, নং ৬১৪]
* আযানের দুআতে "ওয়াদ্ দারাজাতার্ রাফীয়াহ", "ইন্নাকা লা-তুখলেফুল্ মিআদ" এবং " ওয়ার্ যুকনা- শাফা-আতাহু ইয়াও মাল্ কিয়ামাহ" যোগ করা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। [ফিক্হুল্ হাদীস, ১/৩৩২-৩৩৩]

হুইল চেয়ারে ১১২ বছরের বৃদ্ধ

মসজীদে নববীর আন্ডার গ্রাউন্ড অযুখানা হতে উপরে উঠলাম.. দেখি এক বৃদ্ধ হুইল চেয়ারে বসা.. এক মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি তার পায়ের মোজা ঠিক করে পরিয়ে দিচ্ছে.. আসলে এ লোকই বৃদ্ধের চেয়ার ঠেলে তাঁকে মসজিদে নববীতে নামায পড়ার জন্য নিয়ে এসেছে। দেখি, বৃদ্ধের চুল.. দাড়ি.. চোখের ভ্রু.. এমন কি হাত পায়ের লোমও সাদা হয়ে গেছে। সাথে থাকা লোকটি বলছিলঃ এই বৃদ্ধের বয়স ১১২ বছর.. সারা শরীরের লোম চুল সাদা হয়ে গেছে.. কিন্তু আল্লাহর কি বিস্ময়কর ক্ষমতা.. দেখুন.. বৃদ্ধের পায়ের দিকে ইশারা করে বলেঃ এই সাদা লোমের মাঝে নতুন করে আবার কাল লোম বের হচ্ছে.. আমিও আশ্চার্যের সাথে বৃদ্ধের পায়ের দিকে তাকাই.. দেখি, আসলে সাদা লোমের মাঝে কাল লোম..। সাথে থাকা লোকটি বলেঃ অধিক বয়সের কারণে সে ভাল করে শুনতেও পায় না.. বলতেও পারে না.. মসজিদে নববীতে নামায পড়তে আসার

ক্ষমতা তার নেই.. যখনই নামাযের সময় হয়.. এদিক ওদিক তাকায়.. সে যেন আবেদন করে.. বলেঃ আমাকে একটু মসজিদে নববীতে নিয়ে চল.. আমি নামায পড়তে যেতে চাই.. আমিই অনেক সময় তাকে নিয়ে আসি।

হে যুবক ভাই ! সুস্থ ভাই ! ১১২ বছরের বৃদ্ধ হুইল চেয়ার যোগে মসজিদে নামায পড়তে আসতে পারে.. আমরা কেন পারি না.. আমরা কেন আরাম কেদারায় বসে আড্ডা জমাই.. কি উত্তর দেব ? যে দিন মহান রব্বের সামনে উপস্থিত হব.. টি.ভি. দেখছিলাম.. তাস খেলছিলাম.. গল্প করছিলাম..কেনা-বেচা করছিলাম..খেলা- ধুলা করছিলাম.. অন্যদিকে ১১২ বছরের বৃদ্ধ মসজিদে হাজির হয়েছিল !!!

তৃতীয় অধ্যায়ঃ নামাযের বর্ণনা

الباب الثالث: الصلاة: أهميتها ، حكمها ،أوقاتها ، صفتها ...

নামাযের অর্থঃ নামায ফার্সী শব্দ। কুরআন এবং হাদীসে বা শরীয়তের পরিভাষায় উহাকে "স্বালাত" বলা হয়। 'স্বালাত' শব্দের অভিধানিক অর্থঃ দোআ, রহমত, ক্ষমা, প্রার্থনা ইত্যাদি। [আল্ ক্বামূস আল্ মুহীত]

পারিভাষিক অর্থেঃ ' উহা একটি ইবাদত যা বিশেষ কিছু ক্রিয়া এবং কথার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, যা শুরু হয় তকবীরে তাহরীমা দ্বারা এবং শেষ হয় সালাম দ্বারা'। [ফিক্হুস্ সুন্নাহ, ১/৬৭]

নামাযের (স্বালা তর) গুরুত্বঃ

(১) আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর বা কালেমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্য দেয়ার পরে পরেই মুসলিমের প্রতি নামায সার্বিকভাবে সম্পাদন করা জরূরী করা হয়েছে। [হাদীসে মাআয]

(২) নামায ইসলামের মূল স্তম্ভ। [তিরমিযী, ইবনু মাযাহ,আহমদ] স্তম্ভ ব্যতীত যেমন কোন ছাদ হয় না তেমন নামায ব্যতীত মুসলিম হওয়া যায় না।

(৩) কুরআন মজীদে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার একটি মাত্র আদেশ সর্বক্ষণ ও সবসময়ের জন্য হয়ে থাকে এবং তা জরূরী হয়। কিন্তু নামায একটি এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং জরূরী বিধান যার আলোচনা মহান আল্লাহ ৮০ বারের উর্ধ্বে করেছেন। তাহলে এর গুরুত্ব কত বেশি অনায়াসে অনুধাবন করা যায়।

(৪) কেয়ামতের দিনে বান্দার সর্বপ্রথমে যে বিষয়ের হিসাব নেওয়া হবে তা হচ্ছে নামায। নামাযের হিসাব ঠিক হলে বেড়াপার। গোলমাল হলে সব পন্ড হয়ে যাবে। [সিলসিলা সহীহা নং ১৩৫৮]

(৫) প্রিয় নবী (সাঃ) মৃত্যু কালে যে, শেষ অসীয়ত করেছিলেন তা ছিলঃ নামাযের হেফাজত করা এবং দাস-দাসীর খেয়াল রাখা সম্পর্কে। [নাসাঈ,ইবনু মাজাহ]

নামায পরিত্যাগকারীর বিধান / حكم تارك الصلاة

প্রিয় ভাইয়েরা ! এ বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। ইসলামের শুরু যুগে মুসলিম অথচ বেনামাযী এরকম ধারণাই করা যেতনা কিন্তু বর্তমান যুগে মুসলিম অথচ বেশির ভাগই বেনামাযী এটাই তিক্ত সত্য হয়েছে। এই দুই শ্রেণীর মাঝে আর এক শ্রেণী আছে যারা শুধু জুমআর নামায পড়ে থাকে।

উল্লেখ থাকে যে, নামায যে একটি ফরয বিধান যদি কেউ অস্বীকার করতঃ তা পালন না করে তাহলে, সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফের। [ফিকহুস সুন্নাহ,১/৬৮] কিন্তু যে নামাযের প্রতি ঈমান রাখে অর্থাৎঃ বিশ্বাস করে যে নামায আল্লাহর পক্ষ হতে দেয়া শরীয়তের ফরয বিধান তবে, অলসতা ও অবহেলা স্বরূপ নামায পড়েনা। এরকম ব্যক্তি কি ? নিম্নের দলীল-প্রমাণসমূহ পড়ে সাধারণ মানুষও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে।

(১) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ (وَ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ) অর্থঃ (তোমরা নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।) [রূম/৩১] আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যারা নামায পড়েনা তারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

(২) নবীজী বলেনঃ

(بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) رواه مسلم

অর্থঃ কুফর ও শির্ক এবং (মুসলিম) ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যকারী বস্তু হচ্ছে নামায পরিত্যগ করা। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান] বুঝা গেল, নামায ছাড়লে কুফরী এবং মুসলিম ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

(৩) নবীজী আরো বলেনঃ

(الْعَهْدُ الَّذِى بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) رواه الترمذى و ابن ماجه.
অর্থঃ আমাদের এবং কাফেরদের মধ্যে চুক্তি হচ্ছে নামাযের। যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল সে কাফের হয়ে গেল। [সহীহ ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ নামায ছাড়ার বর্ণনা।]

(৪) তিনি (সাঃ) আরো বলেনঃ " ... যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করল না.. সে কিয়ামতের দিন কারুন, ফিরআউন, হামান ও উবাই বিন খালফের সঙ্গে হবে"। [আহমদ, দারেমী] প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ নিজ যুগে কাফেরদের শ্রেষ্ঠ লিডার ছিল।

* ইসলামী বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (রাহেঃ) নামায তরককারীকে 'ফাসেক' বলেছেন এবং বলেছেনঃ তাকে তাওবা করে স্বালাত শুরু করতে হবে। না করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যু দন্ড। ইমাম আবু হানীফা (রাহেঃ) বলেনঃ তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং নামায আদায় না করা পর্যন্ত জেলখানায় বন্দ রাখতে হবে। ইমাম আহমদের উক্তিও প্রায় সেরূপ। [ফিকহুস্ সুন্নাহ, ১/৭০]

নামাযের ফযীলতঃ একদা প্রিয় নবী (সাঃ) সাহাবাদের বলেনঃ মনে কর, তোমাদের মধ্যে কোন লোকের বাড়ির সামনে একটি প্রবাহমান নদী আছে। সেই নদীতে সেই লোক দিনে পাঁচবার গোসল করে। প্রতিদিন পাঁচ বার গোসলের পরেও কি তার শরীরে ময়লা থাকবে ? ময়লা জমা হবে ? সাহাবারা উত্তর দিলেনঃ না, ময়লা থাকার প্রশ্নই উঠেনা। নবীজী এবার বলেনঃ অনুরূপ নামাযের দৃষ্টান্ত। ডেলী পাঁচ ওয়াক্ত যে নামায পড়বে তার গুনাহ থাকতে পারে না। এই সব নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নামাযীর গুনাহ-খাত্বা মুছে দেন, ধুয়ে দেন। [বুখারী, মুসলিস]

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নামসমূহঃ

(১) যহ্রঃ দুপুরের নামাযকে বলা হয়।
(২) আস্র ঃ বিকালের নামাযকে বলা হয়।
(৩) মাগ্ রিব ঃ সন্ধার নামাযকে বলা হয় যা, সূর্য ডুবার পরে আদায় করতে হয়।
(৪) ঈশা ঃ রাতের নামাযকে বলা হয়।
(৫) ফাজ্র ঃ ভোরের নামাযকে বলা হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শুরু এবং শেষ সময়ের বর্ণনাঃ أوقات الصلوات

যহরঃ শুরু সময়ঃ যখন মধ্য আকাশ হতে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যায়।

শেষ সময়ঃ প্রত্যেক বস্তুর ছায়া যখন নিজ বরাবর হয়। অর্থাৎঃ কোন ব্যক্তির দৈর্ঘ যদি ৫/ পাঁচ ফিট হয় তাহলে, তার ছায়ার দৈর্ঘ যখন পাঁচ ফিট হবে তখন যহরের সময় শেষ হবে।

আস্‌রঃ শুরু সময়ঃ প্রত্যেক বস্তুর ছায়া যখন নিজ বরাবর হয়।

শেষ সময়ঃ সূর্য ডুবা পর্যন্ত।

মাগ্‌রিবঃ শুরু সময়ঃ সূর্য অস্ত যাওয়া।

শেষ সময়ঃ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আকাশে যে লাল আভা দেখা যায় তা, শেষ হওয়া পর্যন্ত।

ঈশাঃ শুরু সময়ঃ সূর্য ডুবার পর পশ্চিম দিগন্তে যে, লাল রং দেখা যায় সেই লাল আভা শেষ হলে, ঈশার নামাযের সময় শুরু হয়।

শেষ সময়ঃ অর্ধ রাত পর্যন্ত।

ফাজ্‌রঃ শুরু সময়ঃ সুবহ সাদিক হওয়া। (কাক ভোর হওয়া)

শেষ সময়ঃ সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত।

[মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ এবং নামাযের স্থানসমূহ, অনুচ্ছেদঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচী]

নামায পড়ার নিয়ম জানার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ঃ

নামায আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনার পূর্বে কয়েকটি সহায়ক বিষয় জানিয়ে দেয়া ভাল মনে করছি।

* যে নামাযসমূহ আমাদের প্রতি ফরয করা হয়েছে সে গুলো যথাক্রমেঃ যহরঃ চার রাকাআত। আসরঃ চার রাকাআত। মাগরিবঃ তিন রাকাআত। ঈশাঃ চার রাকাআত। ফজরঃ দুই রাকাআত। এসব নামাযের আগে ও পরে কিছু সুন্নত বা নফল নামায আছে যা, পরে বর্ণিত হবে।

* প্রত্যেক নামাযের একটি পূর্ণ পার্ট-অংশকে রাকাআত বলা হয়।

* এক রাকাআত নামায আদায় করতে যে সব অবস্থায় উপনিত হতে হয় তন্মধ্যে (১) কিয়ামঃ দাঁড়ানো অবস্থা। (২) রুকূঃ হাঁটুতে হাত রেখে স্বশরীরে অর্ধনতবস্থা। (৩) সাজদাঃ কপাল এবং নাক মাটিতে ঠেকিয়ে সারা দেহবনত অবস্থা। (৪) প্রথম তাশাহ্‌হুদঃ তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের দুই

রাকাআত নামায শেষের বৈঠক। (৫) দ্বিতীয় তাশাহ্ হুদ: যে কোন নামাযের শেষ রাকাআতে বসা অবস্থা।

প্লেনের মসজিদ !!

ডোমেস্টিক প্লেন যোগে মদীনা থেকে রিয়াদ ইন্টারন্যাশ্নাল এয়ার পোর্টে .. আমরা কয়েকজন বন্ধু অবতরণ করলাম। তখন রাত প্রায় নয়টা..। দিল্লীগামী সউদী প্লেনের উড়ান সময় ছিল প্রায় রাত তিনটায়.. বিদেশ থেকে স্বদেশে ফিরার মজাই আলাদা.. এই পাঁচ-ছয় ঘন্টা এয়ার পোর্টের মধ্যে ঘোরা-ফেরা, কথা বার্তার মধ্যে কখন যে শেষ হয়ে গেল জানতেই পারলাম না.. সময় মত প্লেন দিল্লী অভিমুখে মহাশূন্যে পাড়ি দিল..যাত্রিরা নিজ নিজ সিটে প্রায় শান্ত.. ঘুম ঘুম ভাব.. প্লেনের বাইরের দৃশ্যটা ছিল আরোও নিঝুম.. আরোও স্তব্ধ.. রাত্রি বেলা তো.. বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না.. হঠাৎ কোন এক ভাই বলে উঠলঃ ফজরের নামাযের সময় হয়েছে.. নামায পড়ে নিন..। আমি সিট থেকে উঠে অযু করার জন্য বাথরুমে গেলাম.. অযু শেষে মনে মনে ভাবছিলাম যে, আপন সিটে বসে বসেই হয়তঃ নামায পড়তে হবে.. তাই নিজ সিটের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিলাম.. এমনি সময় এক ভাই প্লেনের পিছনের দিকে ইশারা করে বলেঃ ওখানে নামায পড়ার স্থান আছে। আমি নিকটে আসি.. দেখি.. একটি চার কোন বিশিষ্ট স্থান.. চারিদিকে ঝুলন্ত পর্দা দ্বারা ঘেরা.. ভিতরে ঢুকতেই সামনের দেয়ালে দেখি একটি যন্ত্র.. কাবা বা কিব্লা কোন্ দিকে.. সে দিকে চিত্র সহ সংকেত দিচ্ছে.. অর্থাৎ সেই দিকে মুখ করে আপনি নামায পড়ুন। প্রায় আট দশ জন একই সাথে নামায পড়তে পারবে.. এতটুকু জায়গা খালি.. আমি ফজরের নামায আদায় করলাম.. আরো অনেকে পড়ল..।

নামায শেষে আমি বসে বসে অনেক কিছু ভাবি.. অন্য কথায়, আমার মন আমাকে অনেক কিছু চিন্তা করতে বাধ্য করে.. নামায প্রতি সাবালক মুসলিমের প্রতি ফরয.. অর্থাৎ সর্বাবস্থায় জরুরী.. এ বিধানের মর্ম আমাদের সমাজের ভাইয়েরা কি বুঝেছে.. বুঝার চেষ্টাও কি করেছে ? আল্লাহ রহম করুক সেই

প্লেন তৈরীকারী ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি.. প্লেনের তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি.. যাঁরা নামাযের গুরুত্ব.. মর্ম.. বুঝেছে.. বাস্তবায়নও করেছে.. নাহলে সেই স্থানে কয়েকটি সিট বসালে পারত..লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করতে..কিন্তু করেন নি.. কারণ তাঁরা আল্লাহকে ভালবাসে.. নামাযকে ভালবাসে..আছেন কি কোন ভাই ..যিনি মূল্যবান স্থানে দোকান তৈরীর সময়.. বাড়ি নির্মাণের সময়.. হোটেল নির্মাণের সময়.. একটু স্থান.. নামায পড়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিবেন !!!

নামায পড়ার পদ্ধতি / صفة الصلاة

১- আপনি যে নামায পড়তে ইচ্ছুক এবং যত রাকাআত পড়তে ইচ্ছুক, উহার অন্তরে ইচ্ছা (নিয়ত) করুন। জায়নামাযে বা লাইনে দাঁড়িয়েই যে এই নিয়ত করতে হবে এমন নয় বরং পূর্ব থেকেই যদি নিয়ত থাকে তাহলে তাহাই যথেষ্ট হবে।

* মুখে বিশেষ আরবী শব্দ পড়ে নিয়ত করা, যেমন বলাঃ "নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি.. .. কিংবা বাংলায় কিছু বলা কখনও নবীজী হতে প্রমাণিত নয়। [বিস্তারিত দেখুন এই বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট নং ২]

২- অতঃপর কিবলা বা কাবাশরীফের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। (১)

* যদি জানা না যায় যে কিবলা কোন্ দিকে তাহলে অনুমান করে এক দিকে নামায পড়ে নিতে হবে। আর তা যদি কিবলার দিকে না হয়ে অন্য দিকে হয় তবুও নামায হয়ে যাবে এবং জানতে পারার পর পুনরায় নামায পড়তে হবে না। (২)

* কিবলামুখী হওয়ার সময় যদি নামাযীর সামনে দেওয়াল, পিলার, লাঠি অর্থাৎঃ কোন বাধাদানকারী বস্তু না থাকে তাহলে, সে যেন কোন বস্তু সাজদার স্থানের সম্মুখে রেখে দেয়। এইরূপ করলে নামাযীর ধ্যান বিক্ষিপ্ত হয় না। শরীয়তের পরিভাষায় ইহাকে 'সুতরা' বলে।

৩ - অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত, দুই কাঁধ বা দুই কান পর্যন্ত

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ ইস্তেযান, হাদীস নং ৬২৫১।
(২) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্য দিকে নামায।
(৩) আবুদাউদ, অধ্যায়ঃনামায, অনুচ্ছেদঃনামাযীকে পথ অতিক্রমকারী হতে কিছু রাখার আদেশ।

এমন ভাবে উঠাতে হবে যেন হাতের তালু এবং আংগুলের তালুদেশ কিবলার দিকে খোলা ভাবে থাকে। এই তকবীরকে তকবীরে তাহরীমা বলে যা, নামাযের প্রথম কাজ এবং ইহা রুক্ন। (১)

৪-অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকে ধারণ করতে হবে।(২)

* নাভীর নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কীয় হাদীসগুলি হাদীস শাস্ত্রের পন্ডিতগণ দুর্বল বলেছেন। (৩)

* উল্লেখ্য যে, মহীলাদের বুকে হাত বাঁধা এবং পুরুষদের নাভীর নিম্নে হাত বাঁধার যে পার্থক্য অনেকের মধ্যে প্রচলিত আছে তা, নিছক তাদের রায় এবং অনুমান। হাদীসে এরকম কোন পার্থক্য বর্ণিত হয়নি।

৫- অতঃপর নামায শুরু করার দোআ নিরবে পাঠ করতে হবে যা, 'সানা' নামে পরিচিত। নবীজী থেকে কয়েকটি সানার বর্ণনা এসেছে তন্মধ্যে অধিক সহীহ সানা যা, বুখারী এবং মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে নিম্নে দেয়া হল। ইহা ব্যতীত অন্য সানা পড়লেও চলবে। নামাযে সানা পড়াকে উলামাগণ সুন্নত বলেছেন তাই উহা ব্যতীত ও নামায হয়ে যাবে তবে জানা থাকলে পড়া উত্তম যেন সুন্নতের প্রতি আমল হয়।

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَ بَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبْ ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسْ ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ والْبَرَدْ .

উচ্চারণঃ " আল্লা-হুম্মা বা-ইদ্ বায়নী ওয়া বায়না খাত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা-বা-আদ্ তা বায়নাল্ মাশ্ রিকি ওয়াল্ মাগরিব। আল্লা-হুম্মা নাক্ কিনী মিনাল্ খাত্বা-ইয়া- ইয়া, কামা য়ুনাক্কাস্ সাউবুল আব্ ইয়াযু মিনাদ্ দানাস। আল্লাহুম্মাগ্ সিল্ খাত্বা-ইয়া- ইয়া বিল্ মায়ি ওয়াস্ সালজি, ওয়াল্ বারাদ্"।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব করে দাও, যেমন দূরত্ব করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, নং ৭৩৬। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ নামাযে যা দ্বারা দুনিয়াবী কাজ হারাম হয় এবং হালাল হয়।

(২) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৭৪০। সহীহ ইবনে খুজাইমাহ, ১/২৪৩। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায,অনুচ্ছেদঃডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা।

(৩) বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, তুহফাতুল্ আহওয়াযী, ২য় খন্ড.পৃ ৭২-৭৯।

পরিচ্ছন্ন কর গুনাহ হতে যেমন, পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হতে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ সমূহ ধুয়ে দাও পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা এবং শিশির দ্বারা"। (১)

৬- অতঃপর " আউযু বিল্লাহিমিনাশ্ শায়ত্বানির্ রাজীম" এবং " বিসমিল্লা-হির্ রাহ্ মানির্ রাহীম" পড়া ভাল এবং উভয়ই নীরবে পড়া বেশী দলীল সম্মত। আউযু বিল্লাহ কেবল প্রথম রাকাআতে পড়তে হবে। (২)

৭- অতঃপর সূরা ফাতেহা (আল্‌হামদু সূরা) পাঠ করুন। নামাযী ব্যক্তি একা একা নামায পড়ুক বা জামাআতের সাথে, ইমাম হোক বা মুক্তাদী সব ক্ষেত্রে তাকে সূরা ফাতেহা পাঠ করা জরূরী। নবীজী বলেনঃ " সেই ব্যক্তির নামায হয়না যে সূরা ফাতেহা পড়ে না"। (৩) জেহরী নামায (উচৈঃস্বর বিশিষ্ট নামায) হলে সশব্দে পড়তে হবে যদি নামাযী ইমাম হয় বা একা হয়। আর সির্‌রী নামায (নিম্ন স্বর বিশিষ্ট নামায) হলে নীরবে পড়তে হবে, নামাযী ইমাম হোক বা মুক্তাদী। মুক্তাদী হলে সর্বাবস্থায় নীরবে পড়তে হবে। [বিস্তারিত আলোচনা দেখুন অত্র বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট নং ১]

উচ্চারণ এবং অর্থ সহ সূরা ফাতেহাঃ-

বিসমিল্লা-হির্ রাহমা-নির রা-হীম। অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি করুণাময় দয়ালু।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (١) اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ (٧)

উচ্চারণঃ (আল্ হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল্ আ-লামীন ০ আর্ রাহ্ মানির্ রাহীম ০ মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন ০ ইইয়া-কা না'বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তাঈন ০ ইহ্ দিনাস্ সিরা-ত্বাল্ মুস্তাকীম ০ সিরা-ত্বাল্লা-যীনা আন্ আম্‌তা আলাইহিম ০ গায়রিল্ মাগ্‌যূবি আলাইহিম্ ওয়ালায্ যা-ল্লীন০)

অনুবাদঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, যিনি

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৭৪৪। মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ।

(২) মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ যারা বলে বিসমিল্লাহ সশব্দে পড়তে হবে না। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ যারা সুবহানাকা আল্লাহুম্মা .. দ্বারা সানা পড়তে বলেন।

(৩) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের কিরাআত জরূরী..।

যিনি পরম দয়ালু করুণাময়। যিনি বিচার দিবসের মালিক। আমরা এক মাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই। আমাদের সরল সহজ পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন; তাদের পথে নয় যারা, অভিশপ্ত ও পথ ভ্রষ্ট''।

৮- আমীন বলা প্রসঙ্গঃ ইমাম যখন ' ওয়ালায্ যা-ল্লীন ' বলবেন তখন ইমামকে আমীন বলতে হবে। সাথে সাথে মুক্তাদীগণকেও 'আমীন' বলতে হবে। একা নামায পড়লেও উক্ত সময়ে 'আমীন' বলতে হবে। জেহ্রী নামাযে উচ্চৈঃস্বরে আর সির্‌রী নামাযে নিরবে। নবীজী বলেনঃ " যখন ইমাম 'আমীন' বলবেন, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কারণ যার আমীন ফেরেস্তাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে''। (১)

ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ " আমি নবীজীকে পড়তে শুনেছি, তিনি (সাঃ) পড়েনঃ (গায়রিল মাগ্‌যূবি আলাইহিম্ ওয়া লায্ যা-ল্লীন) এবং বলেনঃ 'আমীন'। নবীজী তাঁর শব্দকে টেনে পড়েন''। (২)

* হাদীস হতে জানা গেল যে আমীন সশব্দে জোরে টেনে পড়তে হবে। উল্লেখ্য যে, সরবে আমীন বলা প্রসঙ্গে সাহাবাদের সর্বসম্মতি পাওয়া যায়। তিরমিযী সহ অন্য হাদীসে একটি বর্ণনাতে নিরবে আমীন বলার প্রমাণ এসেছে কিন্তু স্বয়ং ইমাম তিরমিযী উহাকে রাবী তথা বর্ণনাকারীর ভুল বলেছেন এবং হাদীসের বহু পন্ডিতগণ "শায" এবং "মুযতারিবের" দোষে দোষী করেছেন যা, সহীহ হাদীসের তুলনায় অগ্রহণীয়। (৩)

৯- যদি নামাযী ইমাম হয় বা একাকী নামায পড়ে তাহলে তাকে সূরা ফাতেহা পড়ার পর কুরআনের যে অংশ তার নিকট সবচেয়ে সহজ, তা পাঠ করতে হবে। উহা একটি ছোট সূরা হোক বা সূরার অংশ বিশেষ। জেহ্‌রী নামায হলে সরবে আর সির্‌রী হলে নিরবে। তবে যদি নামাযী মুক্তাদী হয় আর জেহ্‌রী নামায হয় তাহলে তাকে সূরা ফাতেহার পর, ইমামের কিরআত

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ দাওয়াত, হাদীস নং ৬৪০২, মুসলি, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।
(২) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ আমীন প্রসঙ্গ। আবু দাউদ, আহমদ,বায়হাকী।
(৩) তিরমিযী, তুহফাতুল আহ্ ওয়াযী সহ, ২য় খন্ড পৃঃ ৫৮-৬৯।

মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। আর সির্‌রী হলে মুক্তাদীকেও সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়তে হবে। উল্লেখ্য যে, তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট সির্‌রী নামাযের প্রথম দুই রাকাআতে সূরা ফাতেহার সাথে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কে অন্য সূরা মিলাতে হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাআতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়াই যথেষ্ট। (১)

* কোন কোন সময়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাআতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা পড়াও জায়েয। (২)

(অর্থ সহ দশটি সূরার উচ্চারণ এবং সালাম শেষে প্রয়োজনীয় কিছু পাঠিতব্য দোয়া, নামায পড়ার পদ্ধতি শেষে দেখুন।)

১০- অতঃপর (সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা পড়ার পর) রুকূ করতে হবে। রুকূর নিয়ম হলঃ 'আল্লাহু আক্ বার' বলে দুই হাত কান বা বাহু বরাবর উঠিয়ে, ঝুকে দুই হাত দ্বারা দুই হাঁটু শক্ত করে ধারণ করা। এই সময় দুই হাতের পাঞ্জা পেট থেকে দুরে থাকবে এবং পিঠ ও মাথা বরাবর থাকবে। রুকূ করার সময় শান্ত বা স্থীর হওয়া জরূরী। (৩)

* **রুকূর দোআঃ** রুকূ অবস্থায় তিন বার পড়ুনঃ " সুব্‌হানা রাব্বিয়াল্ আযীম"। অর্থঃ " মহা পবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ"। (৪)

* ইহা ব্যতীত অন্য দোআ পড়ারও প্রমাণ আছে। অনুরূপ তিন বারের অধিকও পড়া যায়। (৫)

১১- অতঃপর "সামিআল্লাহু লিমান্ হামেদাহ্" অর্থঃ 'আল্লাহ শ্রবণ করেছেন যে তাঁর প্রশংসা করেছে' বলে দাঁড়াতে হবে এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাহমীদ পড়তে হবে। অর্থাৎ বলতে হবেঃ "রাব্বানা- ওয়ালাকাল্ হামদ"। এতটুকুর পরে আরো বলতে পারেনঃ " রাব্বানা- ওয়ালাকাল্ হাম্‌দু হামদান্ কাসীরান্ ত্বায়্যিবান্ মুবারাকান্ ফীহ"। অর্থঃ ' হে আমাদের প্রতিপালক আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়' ।[বুখারী, নং৭৯৫ও ৯৯]

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ দ্বিতীয় দুই রাকাআতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে।
(২) মুলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ যোহর এবং আসরের কিরআত।
(৩) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৭৮৪/৭৯০- তিরমিযী, অনুচ্ছেদ নং ১৮৯,১৯০,১৯১।
(৪) মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফেরদের নামায, অনুচ্ছেদঃ নং ২৭ হাদীস নং ১৮১১। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদ নং ১৯২, তুহফা, ২/ ১০৪-১০৮। (৫) ফিকহুস সুন্নাহ, ১/১১৮।

শিশু তার মাকে বলে..।

মানসূর বিন মু'তামার একজন তাবেয়ী ছিলেন..হাদীসের হাফেয ..যখন রাত গভীর হত..তিনি তাঁর সুন্দর পোসাক পরিধান করতেন.. তার পর বাড়ির ছাদে উঠতেন..নফল নামায পড়ার উদ্দেশ্যে..তাহাজ্জুদের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে..পার্শের বাড়িতে এক শিশু ছিল .. সে রাতে যখন ছাদের দিকে তাকাত..অন্ধকারের কারণে চেনতে পারত না যে, ছাদের উপরে রাতে এ কি বস্তু..সে মনে করে বসেছিল যে, ইহা খেজুর গাছের গুঁড়ি..হয়তঃ এই বাড়ির লোকদের কোন বিশেষ কাজে রাতে প্রয়োজন হয় .. আর দিনে প্রয়োজন হয় না.. তাই রাতে দেখা যায় কিন্তু দিনের বেলায় দেখা যায় না..তিনি ইন্তেকাল করেন.. শিশু আর সেই গুঁড়ি দেখতে পায় না.. তাই সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করে.. বলেঃ মা ! আমাদের পার্শের বাড়ির ছাদে প্রতি রাতে, যে খেজুর গাছের কান্ড রাখা হত.. তা আর দেখিনা কেন ? মা উত্তরে বলেঃ বাবা তোমাকে কে বলেছে সেটা খেজুর গাছের গুঁড়ি .. এমন বলো না.. তিনি ছিলেন ইবাদত গুজার বান্দা মানসূর.. রাতে ছাদের উপর নির্জনে নামায পড়তেন..তিনি এখন নেই.. মারা গেছেন ।[সিয়ারু আলামিন্ নুবালা, ৫/৪০৬]

১২- রাফউল ইয়াদাইন প্রসঙ্গ (দুই হাত উত্তোলন করা)

নামায শুরু করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলে দুই হাত কান বা বাহু বরাবর উঠাতে হয়। ইহাকে তকবীরে তাহরীমা বলে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্থান ছাড়া আরো তিন স্থানে হাত তোলার অকাট্য সহীহ্ প্রমাণ এসেছে। (১) রুকূতে যাওয়ার সময় (২) রুকূ হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়। (৩) দ্বিতীয় রাকাআতের তাশাহ্হুদ শেষে, তৃতীয় রাকাআতে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধার সময়। চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন সাহাবী হতে এই আমলের স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। তাই এ আমল করা মানে একটি সুন্দর সুন্নতের প্রতি আমল করা। দলীল সমূহের মধ্যে আমি কেবল সর্ব শ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ বুখারী এবং মুসলিমের একটি হাদীস উল্লেখ করলাম। ইবনে উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী (সাঃ) কে দেখেছি তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন, দুই বাহু বরাবর, দুই হাত তুলতেন। এরূপ রুকূতে যাওয়ার সময়, তকবীর

বলার সময় করতেন এবং যখন রুকূ থেকে উঠতেন তখনও করতেন"। (১) অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ " এবং যখন তৃতীয় রাকাআতের জন্য উঠতেন তখন হাত তুলতেন"।

১৩- সাজদা করার নিয়মঃ

অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে আগে দুই হাত মাটিতে রেখে অতঃপর দুই হাঁটু রেখে সাজদা করতে হবে। (২)

* অনেকের মতে প্রথমে দুই হাঁটু রাখতে হবে তার পর দুই হাত রাখতে হবে। তবে আগে হাত রাখার বর্ণনা গুলিই মুহাদ্দেসীনদের নিকট বেশি শুদ্ধ। (৩)

১৪- সাত অঙ্গের উপর সাজদাঃ

সাজদার সময় শরীরের সাতটি অঙ্গ মাটিতে রাখতে হবে। কপাল সহ নাক, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পা। (৪)

* সাজদার সময়ঃ হাতের তালু মাটিতে থাকবে কিন্তু পাঞ্জা মাটিতে ঠেকে থাকবে না। অনুরূপ হাতের পাঞ্জা পাঁজর থেকে দুরে থাকবে।

* এ সময় পায়ের এবং হাতের আংগুল গুলো কিবলামুখী থাকবে।

* সাজদার সময় দুই হাত কান বরাবর কিংবা বাহু বরাবর থাকবে। (৫)

১৫- সাজদার দোআঃ ধীর স্থীর ভাবে সাজদা করতে হবে এবং সাজদা রত অবস্তায় বলুনঃ " সুব্ হানা রাব্বিয়াল্ আলা"। অর্থঃ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করি আমার প্রভুর যিনি সুউচ্চ। (৬)

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত দোআ তিন বার করে বলা ভাল। অধিকও পড়া যায়। ইহা ছাড়া অন্য দোআরও প্রমাণ আছে। কোন কোন সময় সে সব দোআও পড়া ভাল।

---

(১) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ তকবীর, রুকূ এবং রুকূ থেকে উঠার সময় হাত তোলা। হাদীস নং ৭৩৬। মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদ নং ৯ হাদীস নং ৮৫৯। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ।

(২) আবুদাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ দুই হাতের পূর্বে কিভাবে দুই হাঁটু রাখতে হবে। আহমদ, নাসাঈ, দারেমী, দারাকুত্বনী।

(৩) তুহফাতুল আহ্ ওয়াযী, তিরমিযী সহ ২য় খন্ড পৃঃ ১১৭-১২৪।

(৪) বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৮১০। (৫) ফিকহুস সুন্নাহ, ১/১২১।

(৬) মুসলিম, সালাতুল মুসাফেরীন, অনুচ্ছেদ নং ২৭, হাদীস নং ১৮১১।

১৬- সাজদা হতে উঠা এবং এ সময়ের দোআঃ- অতঃপর ''আল্লাহু আকবার'' বলে সাজদা হতে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসুন এবং ডান পায়ের পাতার অগ্রভাগ মাটিতে রেখে গোড়ালি খাড়া রাখুন এবং পড়ুনঃ ''আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্ লী, ওয়ার্ হাম্ নী, ওয়াজ্ বুরনী, ওয়াহ্ দিনী, ওয়ার্ যুকনী''। অর্থঃ হে আল্লাহ ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎ পথ প্রদর্শণ করুন ও আমাকে রুযী দান করুন''। [আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ের দোআ। তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৩]

অতঃপর : 'আল্লাহু আকবার' বলে পুনরায় প্রথম সাজদার মত সাজদা করুন। সাজদা রত অবস্থায় বর্ণিত দোআ পড়ুন। তার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে প্রথম সাজদা শেষে যে ভাবে বসেছিলেন সে ভাবে বসুন।

* অর্থাৎ: একটি পূর্ণ সাজদার দুটি অংশ থাকে। দুই অংশ মিলে একটি পূর্ণ সাজদা হয়। এতক্ষণে প্রায় এক রাকাআত নামায সমাপ্ত হল। শুধু 'তাহিয়্যাহ' এবং দরূদ বাকী।

১৭- রুকূ, সাজদা এবং সাজদার মধ্যবর্তী সময়সীমাঃ- বারা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ '' নবীজীর রুকূ, সাজদা, রুকূ হতে উঠে সাজদায় যাওয়ার মধ্যবর্তী সময় এবং দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়-সীমা প্রায় সমান হত''। [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৮০১]

১৮- দ্বিতীয় রাকাআত পড়ার নিয়মঃ প্রথম রাকাআতের সাজদা শেষে স্থীর হয়ে বসে দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য মাটির উপর হাতে ভোর দিয়ে দাঁড়ান। অতঃপর পূর্বের প্রথম রাকাআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকাআত পড়ুন। সাজদা শেষে তাশাহ্ হুদ দিন। ইহা প্রথম তাশাহ্ হুদ হলে শুধু তাহিয়্যাহ পড়ুন আর দ্বিতীয় তাশাহ্ হুদ হলে তাহিয়্যাহ এবং দরূদ উভয় পড়ুন ।

১৯- তাশাহ্ হুদের বিবরণঃ- নামাযে তাশাহ্ হুদ বলতে বৈঠককে বুঝায়। এই তাশাহ্ হুদ বা বৈঠক দুই প্রকারের। (ক) প্রথম তাশাহ্ হুদ (প্রথম বৈঠক) (খ) দ্বিতীয় তাশাহ্ হুদ (দ্বিতীয় বৈঠক)। তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকাআত নামাযের সাজদার পর যে বৈঠক হয় উহাকে প্রথম তাশাহ্ হুদ বলে। এই বৈঠকে শুধু ''আত্ তাহিয়্যাহঃঃ পড়তে হয়।

অতঃপর উঠে বাকী নামায সম্পন্ন করতে হয়। তিন, এবং চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ রাকাআতের সাজদা শেষে যে বৈঠক দিতে হয়, উহাকে দ্বিতীয় তাশাহ্ হুদ বলে। এই বৈঠকে "তাহিয়্যাহ" এবং "দরূদ" উভয়ই অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়াও আরো কিছু দোআর প্রমাণ আছে সে সবও পড়া ভাল।

২০- তাশাহ্ হুদ বা বৈঠকের নিয়মঃ প্রথম বৈঠকে বসার সময় বাম পায়ের পাতার উপর বসতে হবে এবং ডান পায়ের অগ্রভাগ মাটিতে রেখে গোড়ালী খাড়া রাখতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় বৈঠকের সময় বাম পা ডান পায়ের জংঘার মাঝে রেখে নিতম্বের উপর বসতে হবে। [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হাদীস নং ৮২৮]

* তাশাহ্ হুদের সময় ডান হাত ডান উরুর উপরে এবং বাম হাত বাম উরুর উপরে রাখতে হবে এবং ৫৩ বাঁধার মত বাঁধতে হবে। অর্থাৎঃ বুড়ো আংগুলের মাথা তর্জনী আংগুলের প্রথম গিরায় রাখতে হবে এবং তা দ্বারা ইশারা করতে হবে। কিংবা কনিষ্টা ও অনামিকা আংগুল বন্ধ করে মধ্যমা এবং বুড়ো আংগুল দ্বারা বালার মত গলাকার করে তর্জনী দ্বারা ইশারা করতে হবে। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ মাসাজিদঃ অনুচ্ছেদ, নামাযে বসার পদ্ধতি। আবুদাউদ, নামায, অনুচ্ছেদঃ তাশাহ্ হুদে ইশারা করা।]

* "তাহিয়্যাহ" পড়ার সময় ' আশ্ হাদু আন্ লা-ইলা-হা.. বলার সময় তর্জনী আংগুল দিয়ে শুধু এক বার ইশারা করার যে কথা প্রচলিত আছে তার স্বপক্ষে কোন সহীহ্ দলীল পাওয়া যায় না। বরং হাদীস সমূহ বৈঠকের পুরো সময়েই একাধিক বার ইশারা করা সমর্থন করে। [তুহফাতুল আহ্ ওয়াযী, ২/১৫৯] এ সময় নামাযীর দৃষ্টি ইশারার দিকে থাকবে। [আবু দাউদ, অধ্যায় নামায]

২১- অর্থ ও উচ্চারণ সহ "তাহিয়্যাহ"ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ،أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ .

উচ্চারণঃ আত্ তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি ওয়াস্ সালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বাইয়িবা-তু, আস্ সালা-মু আলাইকা আইয়ুহান্ নাবিইউ, ওয়া রাহ্ মাতুল্লা-হি ওয়া বারা-কা-তুহু, আস্ সালা-মু আলাই না- ওয়া আলা- ইবা-দিল্লা-হিস্ স্বা-লেহীন,

আশ্ হাদু আন্ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আব্ দুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থঃ- সমস্ত সম্মান, সমস্ত ইবাদত ও সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহর জন্য। হে নবী ! আপনার প্রতি শান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহর নেক কার বান্দাদের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, নং ৮৩১]

২২-উচ্চারণ ও অর্থ সহ দরূদঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْد ،اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْد .

উচ্চারণঃ " আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মুহাম্মাদ, ওয়া আ'লা- আলে মুহাম্মাদ, কামা- সাল্লাইতা আলা ইব্ রা-হীম, ওয়া আলা- আ-লে ইব্ রা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারেক্ আ'লা মুহাম্মাদ, ওয়া আ'লা আলে মুহাম্মদ, কামা- বা-রাক্ তা আ'লা ইব্ রা-হীম, ওয়া আ'লা আলে ইব্ রা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ"।

অর্থঃ " হে আল্লাহ ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত"।

* ইহা ব্যতীত আরো কিছু দোআর প্রমাণ এসেছে, সে সব দোআও পড়া ভাল।

২৩- সালাম বা নামায সমাপ্তিকরণঃ 'তাহিয়্যাহ' এবং 'দরূদ' পড়ে নামাযী নামায সমাপ্ত করতে পারে। নিয়ম হলঃ প্রথমে ডান দিকে চেহারা ঘুরিয়ে বলবেঃ " আস্ সালা-মু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ"। অতঃপর বাম দিকেও অনুরূপ বলতে হবে। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদের বর্ণনা]

একত্রিত দুআ / মুনাজাতঃ আমাদের দেশে বেশিরভাগ মসজিদে প্রতি ফরয নামায শেষে, ইমাম সাহেব মুক্তাদী বর্গকে নিয়ে নিয়মিত যে দুআ করে থাকেন, এরকম দোআর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বর্তমান মক্কা-মদীনা তথা সারা সউদী আরবের ছোট বড় কোন মসজিদে এরকম দোআ হয় না।
[বিস্তারিত আলোচনা দেখুন এ বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট নং ৩]

সূরা, দোআ জানে না, এরকম লোক কি ভাবে নামায পড়বে ?

যে ব্যক্তি কুরআনের কোন সূরা জানে না সে নিম্নের বাক্যগুলি দ্বারা নামায পড়বে।

" সুব্ হা-নাল্লা-হ"। (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি)
"আল্ হামদু লিল্লা-হ"। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর)
"লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ"। (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই)
" আল্লা-হু আক্ বার"। (আল্লাহ সবচেয়ে বড়)
" ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুও আতা ইল্লা বিল্লা-হ"। (আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি সামর্থ নেই।) [আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ অজ্ঞ এবং আজমী ব্যক্তির ক্ষেত্রে যতখানি কুরআন পড়া যথেষ্ট।]

উল্লেখ থাকে যে, এরকম ভাইকে অতি শিগ্‌গির সূরা ফাতেহা সহ কুরআনের অন্য কিছু সূরা এবং নামাযের বাকী প্রয়োজনীয় দোআসমূহ মুখস্ত করতে শুরু করতে হবে। যত দিনে না পারবে ততদিন ধরে উল্লেখিত দোআগুলো বললেই নামায হয়ে যাবে।

নামাযে ভুল হলে বা সন্দেহ হলে ..

ভুল-ভ্রান্তি মানুষের স্বভাব। তাই নামাযেও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ভুলের সমাধানার্থে নবীজী সাজদায়ে সাহুর (ভুলের সাজদার) বিধান দিয়েছেন। নিম্নে ভুল ও সন্দেহের সম্ভাব্য কয়েকটি স্থানের বর্ণনা ও শারয়ী সমাধান তুলে ধরা হলঃ-

ক - যদি সন্দেহ হয় যে, এক রাকাআত পড়লাম না দুই রাকাআত, তিন রাকাআত পড়লাম না চার রাকাআত তাহলে, যে রাকাআতের প্রতি সন্দেহ প্রবল হচ্ছে তা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত রাকাআত গণনা করুন। অর্থাৎঃ এরকম ক্ষেত্রে নিম্ন রাকাআত গণনা করুন অতঃপর বাকী নামায পূর্ণ করুন। যেমন

যদি সন্দেহ হয় যে এক রাকাআত পড়লাম না দুই রাকাআত তাহলে সেটাকে এক রাকাআত মনে করে বাকী নামায পূর্ণ করুন। অতঃপর তাশাহ্ হুদ শেষে আল্লা-হু আক্ বার বলে দুটি সাজদা করে সালাম ফিরান ।[মুসলিম, মাসাজিদ, অনুচ্ছেদঃ নামাযে সাহু হলে..। তিরমিযী, নামায, অনুচ্ছেদঃ নামাযরত অবস্থায় কম বা বেশির সন্দেহ হলে..।]

খ- তিন বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকাআত নামায শেষে প্রথম তাশাহ্ হুদ (বৈঠক) না করে উঠে যাওয়া। এরকম হলে শেষ রাকাআতে পূর্বের মত সালাম ফিরানোর পূর্বে 'আল্লাহু আক্ বার' বলে দুটি সাজদা দিয়ে সালাম ফিরান। [বুখারী, আযান, হাদীস নং ৮২৯, ৮৩০]

গ- ভুলে চার রাকাআতের পরিবর্তে তিন রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলে, এক রাকাআত পুনরায় পড়ে সালাম ফিরানোর পর পুনরায় তকবীর দিয়ে দুটি সাজদা করে সালাম ফিরান। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, হাদীস নং ৫৭৪]

ঘ- অনুরূপ চার রাকাআতের পরিবর্তে পাঁচ রাকাআত হয়ে গেলে, সালাম শেষে পুনরায় তকবীর দিয়ে দুটি সাজদায়ে সাহু করুন। [বুখারী, হাদীস নং ৪০১]

* যদি নামাযী এসব বিধান না জানে কিংবা বর্ণিত স্থান ছাড়া অন্য স্থানে ভুল করে বসে তাহলে, যেহেতু হাদীসে সালামের পূর্বে ও পরে উভয় স্থানে সাজদায়ে সাহুর প্রমাণ এসেছে সেহেতু আগে বা পরে যে কোন এক স্থানে সাজদা দিলে নামায হয়ে যাবে ইন শাআল্লাহ। [নামাযে নববী পৃঃ ২০৩]

* প্রকাশ থাকে যে শুধু এক দিকে সালাম ফিরানোর পর দুটি সাজদায়ে সাহু দিয়ে পুনরায় তাশাহ্ হুদ পড়ে আবার দুই দিকে সালাম ফিরানোর প্রথা সুন্নত হতে প্রমাণিত নয়।

দুটি বাক্য, বলতে সহজ ..

খুব কম মানুষকে দেখা যায়.. যারা উঠতে বসতে.. কথা-বার্তায়.. আল্লাহর যিক্র করে.. স্বরণ করে। তবে এক বৃদ্ধ ছিল.. যার মুখে একটি যিকর.. স্থান করে নিয়েছিল..এই যিক্র চয়নের ক্ষেত্রে.. বৃদ্ধ বিচক্ষণতার প্রমান দিয়েছিল.. কারণ নবীজী এই যিক্রের সম্পর্কে বলেছেনঃ " দুটি বাক্য এমন.. যা বলতে

খুব সহজ..কেয়ামতের দিনে.. পাল্লায় হবে অত্যান্ত ভারী..আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়.. বাক্য দুটি হচ্ছেঃ (সুবহানাল্লাহে ওয়াবিহামদিহী, সুব্হানাল্লাহিল আযীম।) বৃদ্ধ লোকটির মুখে মুখে.. এই দুটি কথা.. শরীরে কম্পন.. হাতে লাঠি..আর মুখে এই দুটি বাক্য..পথে চলার সময়.. দুষ্ট বালক দেখলে.. নামাযের সময় .. নামায হতে গাফেল..আড্ডা দেয়..এমন লোক দেখলে.. বৃদ্ধ তার সেই দুটি কথা বলত..। বলতোঃ বাবারা ! সুব্হানাল্লাহে.. .. তাদের সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করত।

এই বৃদ্ধ একদা অসুস্থ হলে.. হাসপাতালে ভর্তি করা হয়.. চিকিৎষক এক অমুসলিম ডাক্তার..বৃদ্ধের আরবী ভাষাও এ ডাক্তার জানে না। এক ক্ষেত্রে হঠাৎ বৃদ্ধ বেহুশ হয়ে ডাক্তারের উপর ঢলে পড়ে..ডাক্তারের কোলে বৃদ্ধের মাথা..ডাক্তার বৃদ্ধের দিকে তাকায়.. হঠাৎ বৃদ্ধের জ্ঞান ফিরে.. চোখ খুলে.. খোলা মাত্রেই বলে উঠে.. বাবা ! দুটি বাক্য বলতে সহজ..পরীমাপে ভারি..আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়.. " সুব্ হানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী, সুব্হানাল্লাহিল আযীম"। ডাক্তার আশ্চার্য ! এ কি কথা ? হুশ আসা মাত্রেই এ কথা ! অবশ্যই কোন কারণ আছে। হয়তঃ এ কারণেই বৃদ্ধ বেহুশ হয়েছিল.. কোন দারুন আঘাতকারী কথা হবে হয়তঃ.. ডাক্তার বেহুশ হওয়ার কারণ খোঁজে..এক .ব্যক্তিকে ডাকে..বলেঃ দেখুন তো এ বৃদ্ধ রোগী কি বলে ? ডাক্তারকে এর অর্থ বুঝানো হয়.. ব্যাখ্যা বুঝানো হয়..ডাক্তারের মনে বৃদ্ধের এই আমল.. নবীজীর এই বাণী.. রেখাপাত করে.. সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হয়। [কাসাস্ ওয়া ইব্ রাত, পৃঃ ১৮]

সালামের পর পাঠিতব্য কিছু দোআ ও যিক্র / الأذكار بعد الصلاة

(১) সালাম ফিরানোর পর পড়ুন তিনবারঃ " আস্তাগ্ ফেরুল্লা-হ"।
অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

অতঃপর পড়ুন একবারঃ " আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ সালা-ম, ওয়া মিন্ কাস্ সালা-ম তাবা-রাক্তা ইয়া- যাল্ জালা-লি ওয়াল্ ইকরা-ম"।

অর্থঃ " হে আল্লাহ ! আপনি শান্তিময়। আপনিই শান্তি দেন। আপনি বরকতময়, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক" । [মুসলিম]

(২) " আল্লাহহুম্মা আ'ইন্নী আলা- যিক্ রিকা ওয়া শুক্ রিক, ওয়া হুস্নি ইবা-দাতিক" ।

অর্থঃ " হে আল্লাহ ! আপনাকে স্বরণ করা, আপনার শুকরিয়া আদায় করা এবং আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর । [আবু দাউদ]

(৩) " লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্ দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল্ হামদু ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর। আল্লা-হুম্মা লা- মানিয়া লিমা- আ'ত্বায়তা ওয়ালা- মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'তা, ওয়ালা- ইয়ান্ ফাউ যা-ল্ জাদ্দি মিন্ কাল্ জাদ্দু" ।

অর্থঃ- নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত, যিনি একক ও শরীকবিহীন। তাঁরই জন্য রাজত্ব, তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী। হে আল্লাহ আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই এবং আপনি যা, রোধ করেন, তা দেওয়ার কেউ নেই। আপনি ছাড়া, কোন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না" । [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান]

(৪) (আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা-হুয়াল্ হাইয়ুল্ ক্বাইয়ূম। লা-তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা-নাউম। লাহু মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মা-ফিল্ আর্য। মান্ যাল্লাযীঁ ইয়াশ্ ফাউ ইন্দাহু ইল্লা-বি ইয্নিহী, ইয়ালামু মা-বাইনা আয়দীহিম ওয়া মা-খাল্ ফাহুম, ওয়া লা-ইউ হীতুনা বিশাইয়িম মিন্ ইলমিহী ইল্লা-বিমা- শা-আ- ওয়াসিয়া কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্ য, ওয়ালা-ইয়াউদুহু হিফযুহুমা- ওয়া হুআল্ আলিইয়ুল্ আযীম।)

অর্থঃ (আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণকারী, তন্দ্রা ও ঘুম তাঁকে স্পর্শ করে না, আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁরই ; এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে ? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সব কিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে এবং এসবের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয় না এবং তিনি সমুন্নত মহীয়ান।) [সূরা বাকারাহ/২৫৫]

* নবীজী বলেনঃ " যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামায পর "আয়াতুল কুরসী ' পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত কোন কিছু তার জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা হবে না" । [নাসাঈ, সহীহ্ হাদীস সিরিজ নং ৯৭২]

(৫) ৩৩/ তেত্রিশবার "সুবহানাল্লা-হ" । অর্থঃ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি।
৩৩/ তেত্রিশবার "আলহামদু লিল্লা-হ" । অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।
৩৩/ তেত্রিশবার "আল্লা-হু আক্ বার" । অর্থঃ আল্লাহ সবচেয়ে বড়।
৩৩+৩৩+৩৩ =৯৯। অতএব একশত পূরণে পড়তে হবেঃ " লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হামদু , ওয়া হুআ আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর"। ইহা মনে না থাকলে " আল্লাহু আকবার" ৩৪ বার পড়ুন।

* নবীজী (সাঃ) বলেনঃ " যে ব্যক্তি প্রতি নামায শেষে এরূপ আমল করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়" । [মুসলিম, অধ্যায়ঃ মাসাজিদ]

আপনি কি কুরআন পড়া শেখতে চান ?

 # মাত্র এক মাসে যে কোন ভাই কুরআন শরীফ পড়া শেখতে পারেন।
নিম্নে একটি সাধারণ তালিকা দেয়া হলঃ -
আরবী বর্ণ পরিচয়ঃ - তিনটি ক্লাস, তিন দিন।
আরবী বর্ণমালার উচ্চারণ শিক্ষা ও চর্চাঃ- সাতটি ক্লাস, এক সপ্তাহ।
যের, যবার, পেশ, জযম, তাশদীদ, তান্‌উইন অর্থাৎ, হারকাত পরিচয় ও চর্চা ঃ- তিনটি ক্লাস, তিন দিন।
যুক্ত অক্ষর পরিচয় ও চর্চাঃ- তিনটি ক্লাস, তিন দিন।
বানান শিক্ষা ও চর্চাঃ- সাতটি ক্লাস, সাতদিন।
বিবিধ শিক্ষাঃ- এক সপ্তাহ। মোটঃ ৩+৭+৩+৩+৭+৭= ৩০ দিন।
আছেন কি কোন ভাই, যিনি জীবনের হাজারো মাসের মধ্যে মাত্র একটি মাস আল্লাহ তাআলার বাণী, কুরআন শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যয় করবেন ?

বিনিময়ে পাবেন এক একটি অক্ষরের বদলে এক একটি নেকী। কেন না আগামী কাল থেকে বা ছুটির মাসে বা রমযান মাসে এ কাজ আরাম্ভ করি ! এর পর কুরআনের অর্থ জানাও বর্তমানে সহজ। যে কোন একটি বিশ্বস্ত বাংলা অনুবাদ কুরআন মজীদ ক্রয় করলে অর্থ হতে উপকৃত হতে পারেন।

বাংলা উচ্চারন ও অর্থ সহ ১০টি সূরা

বিদ্রঃ আরবী আয়াতসমূহ বাংলায় পড়ার সময় [া- ি- ু-] টেনে পড়বেন না। যে অক্ষরের পরে [ী- ূ- ঈ- ঊ এবং (-) হাইফেন] থাকবে, উহা টেনে পড়ুন। যেমনঃ ' আ-লামীন ' শব্দের, (আ-) এবং (মী) টেনে পড়ুন তবে (লা) বিনা টেনে পড়ুন।

(১) সূরা ফীল

* আউযু বিল্লা-হিমিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজীম।

অর্থঃ বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা চাচ্ছি।

* বিস্ মিল্লা-হির্ রাহমা-নির্ রাহীম।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় দয়ালু।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ • اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيْلٍ . وَ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ . تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ . فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ .

উচ্চারণঃ আলাম্ তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বি আসহা-বিল্ ফীল্ (১) আলাম্ ইয়াজ্ আল্ কাইদাহুম্ ফী তাযলীল্ (২) ওয়া আর্ সালা আলাইহিম্ ত্বায়রান্ আবা-বীল (৩) তারমীহিম্ বি হিজা-রাতিম্ মিন্ সিজ্জীল্ (৪) ফাজাআলাহুম কাআসফিম্ মা'কূল (৫)

অর্থঃ- আপনি কি দেখেন নি আপনার প্রভু হস্তীবাহিনীর সহিত কিরূপ আচরণ করেছেন ? (১) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি ? (২) তিনি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (৩) যারা তাদের উপরে পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল (৪) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করে দিলেন (৫)।

(২) সূরা কুরাইশ

বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।

لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ . اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَالْبَيْتِ .
الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّ اٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ .

উচ্চারণঃ- লিঈলা-ফি কুরায়শ্ (১) ঈলা-ফিহিম রিহ্ লাতাশ্ শিতা-ই ওয়াস্ স্বায়ফ (২) ফাল্ ইয়া'বুদূ রাব্বা হা-যাল্ বাইত (৩) আল্লাযী আত্বআমাহুম্ মিন্ জূ ; ওয়া আ-মানাহুম মিন্ খাউফ (৪)

অর্থঃ- কুরাইশদের আসক্তির কারণে (১) তাদের আসক্তির কারণে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের (২) অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের প্রভুর (৩) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্ন দিয়েছেন ও ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন (৪)

(৩) সূরা মাঊন

বিস্ মিল্লা-হির রাহ্ মা-নির রাহীম।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ . فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ . وَ لَا يَحُضُّ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ . فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ . اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُوْنَ . اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ . وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ .

উচ্চারণঃ- আরাআয়তাল্লাযী য়ুকায্যিবু বিদ্দীন (১) ফাযা-লিকাল্লাযী ইয়াদুউ উল্ ইয়াতীম(২) ওয়া লা- ইয়াহুয্যু আলা- ত্বাআমিল্ মিস্ কীন (৩) ফাওয়ায়লুল্ লিল্ মুসাল্লীন (৪) আল্লাযীনাহুম্ আন্ স্বালা-তিহিম সা-হূন (৫) আল্লাযীনাহুম য়ুরা-উন (৬) ওয়া ইয়াম্ নাউনাল্ মাউন (৭)

অর্থঃ- তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে ? (১) সে তো সেই ব্যক্তি যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় (২) এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করে না (৩) সুতরাং পরিতাপ সেই নামাযীদের জন্যে (৪) যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী (৫) যারা লোক দেখানর জন্যে উহা করে (৬) এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু অন্যকে দেয় না (৭)

(৪) সূরা কাওসার

বিস্ মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ . اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ .

উচ্চারণঃ- ইন্না- আ'ত্বায়না-কাল্ কাওসার্ (১) ফাসাল্লে লেরাব্বেকা

ওয়ান্ হার্ (২) ইন্না শা-নে আকা হুআল্ আব্ তার্ (৩)

অর্থঃ- আমি অবশ্যই তোমাকে 'হাউযে কাউসার দান' করেছি (১) অতএব আপনি আপনার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন (২) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরাই নির্বংশ। (৩)

(৫) সূরা কা-ফিরূন

বিস্ মিল্লা-হির রাহ্ মানির রা-হীম।

قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ . لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ . وَ لاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدْ . وَ لاَ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ . وَلاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدْ . لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِىَ دِيْنْ .

উচ্চারণঃ- কুল্ ইয়া- আইয়ুহাল্ কা-ফেরূন (১) লা-আ'বুদু মা- তা'বুদূন (২) ওয়ালা-আন্‌তুম আ-বিদূনা মা-আবুদ (৩) ওয়ালা-আনা আ-বিদুম্ মা-আবাদ্‌তুম (৪) ওয়ালা- আন্ তুম আবেদূনা মা- আ'বুদ্ (৫) লাকুম্ দীনুকুম্ ওয়া লিয়া দ্বীন। (৬)

অনুবাদঃ- বলুন ! হে কাফেরগণ ! (১) আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর (২) এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৩) আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যার ইবাদত কর (৪) এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি (৫) তোমাদের দ্বীন (কুফর) তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন (ইসলাম) আমার জন্য (৬)

(৬)সূরা নাস্‌র

বিস্ মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ . وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِى دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا .

উচ্চারণঃ ইযা- জা-আ নাস্ রুল্লাহি ওয়াল্ ফাত্‌হ্ (১) ওয়া রাআয়তান্না-সা ইয়াদ্ খুলূনা ফী দ্বীনিল্লাহে আফ্ ওয়া-জা (২) ফাসাব্বিহ্ বিহাম্ দি রাব্বেকা ওয়াস্ তাগ্ ফিরহু , ইন্নাহু কা-না তাউ ওয়া- বা- (৩)

অর্থঃ- যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় (১) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন (২) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা সহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবূলকারী(৩)

(৭) সূরা লাহাব্

বিস্ মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ . مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ . سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ . وَامْرَاَتُهٗ ، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ . فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ .

উচ্চারণঃ- তাব্বাত্ ইয়াদা- আবী লাহাবিউঁ ওয়া তাব্ব (১) মা- আগ্ না-আন্হু মা-লুহু ওয়া মা-কাসাব্ (২) সাইয়াস্লা- নারান্ যাতা লাহাব্ (৩) ওয়াম্ রাআতুহু হাম্মা-লাতাল্ হাতাব্ (৪) ফীজীদিহা- হাব্ লুম্ মিম্ মাসাদ্ (৫)

অর্থঃ- আবুলাহাবের দুই হাত ধ্বংস্ হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে (১) তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন, তার কোন উপকারে আসেনি (২) অচিরেই সে লেলিহান জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে (৩) এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহনকারী ছিল (৪) নিজ গলায় খেজুরের আঁশের দড়ি নিয়ে (৫)

(৮) সূরা ইখলা-স

বিস্ মিল্লা-হির রাহ্ মা-নির রাহীম।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ . اَللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ . وَ لَمْ يُوْلَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ .

উচ্চারণঃ- কুল্ হুআল্লা-হু আহাদ্ (১) আল্লা-হুস্ সামাদ্ (২) লাম্ ইয়ালিদ্, ওয়া লাম্ ইউলাদ্ (৩) ওয়ালাম্ ইয়াকুল্ লাহু কুফুআন্ আহাদ্ (৪)

অর্থঃ- আপনি বলে দিন, তিনি আল্লাহ একক (১) আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন (২) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো জন্মিত নন (৩) এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই (৪)

(৯) সূরা ফালাক্ব

বিস্ মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْ . وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ . وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدْ . وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ .

উচ্চারণঃ- কুল্ আউযু বি রাব্বিল্ ফালাক্ব (১) মিন্ শার্ রি মা-খালাক্ব (২) ওয়া মিন্ শার্ রি গা-সিকিন্ ইযা- ওয়াকাব্ (৩) ওয়া মিন্ শার্ রিঁন্ নাফ্ফা-সা-তি ফিল্ উকাদ্ (৪) ওয়া মিন্ শাররি হা-সিদিন্ ইযা- হাসাদ্ (৫)

অর্থঃ- আপনি বলুন ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের পালনকর্তার নিকটে (১) তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে (২) রাত্রির অনিষ্ট হতে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় (৩) এবং গ্রন্থিতে ফুঁকদান কারিনী মহিলাদের অনিষ্ট হতে (৪) এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে (৫)

(১০) সূরা নাস

বিস্ মিল্লা-হির রাহ্ মা-নির রাহীম।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسْ . مَلِكِ النَّاسْ . اِلٰهِ النَّاسْ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاس
الْخَنَّاسْ . الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسْ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسْ .

উচ্চারণঃ- কুল্ আউযু বি রাব্বিন্না-স্ (১) মালিকিন্না-স্ (২) ইলা-হিন্না-স্ (৩) মিন্ শার্ রিল্ ওয়াস্ ওয়া-সিল্ খান্না-স্ (৪) আল্লাযী ইয়ু ওয়াস্ বিসু ফী সুদূরিন্না-স্ (৫) মিনাল্ জিন্নাতে ওয়ান্না-স্ (৬)

অর্থঃ- আপনি বলুন ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের পালনকর্তার, (১) মানুষের মালিকের, (২) মানুষের মাবুদের নিকটে (৩) গোপন কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে (৪) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৫) জিন এবং মানুষের মধ্য হতে (৬)

****

সাক্ষাৎ করে খুর কাঁচি নিয়ে ..

বাদশাহ আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান তার ছেলে উমরকে শহরে পাঠান.. উদ্দেশ্য নিজ পুত্রকে, যোগ্য উস্তাদ দ্বারা শিক্ষা দেওয়া .. আদর্শবান পুত্র হিসেবে ছেলেকে দেখতে চান বাদশাহ ..অন্যদিকে বাদশাহ, সালেহ বিন কায়সান নামক এক ব্যক্তিকে আদেশ করেনঃ যেন সে তাঁর ছেলে উমরের দিকে লক্ষ্য রাখে.. কোন প্রকারের অবহেলা সে করছে না তো ..? সালেহ, বাদশাহর ছেলে উমরের নামাযের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে.. একদা উমর নামাযে দেরিতে পৌঁছে.. জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ দেরির কারণ কি ? উমর মিথ্যা বলে না.. বলেঃ মাথার চুলের সিঁথি করতে করতে দেরি হয়ে গেল.. সে বলেঃ চুলের ভালবাসা তোমাকে এত দুরে ঠেলে দিয়েছে যে তুমি চুলের যত্ন করতে গিয়ে নামাযে সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারনা ! ? চুলের কারণে তোমার নামাযে দেরি হয় ! সে বাদশাহকে এ খবর জানায়.. বাদশাহ এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে ..সে লোক উমরের সাথে সাক্ষাৎ করে খুর কাঁচি নিয়ে .. কোন কথা বলার পূর্বে তার মাথা নেড়া করে দেয় .. অতঃপর অন্য কথা-বার্তা বলে ।[ইল্লা লি ইয়াবুদূন, পৃঃ ২৯]

সুন্নত / নফল নামাযের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি যা ফরয / জরূরী করেছেন উহা ব্যতীত সবই নফল। তাহা সুন্নতও বটে। নফল নামায বা নফল ইবাদত এমন আমলকে বলা হয় যা, পালন করা ভাল তবে না পালনকারীর জন্যে আল্লাহ কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন নি। অনুরূপ তাকে মন্দও বলেন নি। নফল ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ লাভ এই যে, বান্দার ফরয ইবাদতে যদি কোন প্রকার ত্রুটি বা কমী হয় তাহলে নফল ইবাদতের মাধ্যমে তা পূর্ণ করা হয়।

* হাদীসে এসেছে, আল্লাহ বলবেনঃ " খোঁজ করে দেখ আমার বান্দার নফল কিছু আছে না কি ? থাকলে তা দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূর্ণ করে দাও"। [আবু দাউদ, আহমদ, ইবনু মাজাহ]

* নফল নামায সমূহের মধ্যে অধিকতর নেকী এবং মর্যাদা সম্পন্ন নামায হচ্ছে, তাহাজ্জুদের নামায, বিতরের নামায এবং পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের

আগে ও পরে ১২ রাকাআত নামায। এই ১২ রাকাআত নামাযকে ফোকাহাদের পরিভাষায় সুন্নতে মুআক্কাদাহ বা সুন্নতে রাতেবাহ বলা হয়।

সুন্নতে মুআক্কাদার সংখ্যা এবং ফযীলত

" সুন্নতে মুআক্কাদাহ " অর্থাৎঃ এমন সুন্নত যার প্রতি তাগিদ এসেছে এসব সুন্নত নামায ঘরে পড়া ভাল। [বুখারী, আযান, নং ৭৩১]

নবীজী (সাঃ) বলেনঃ " যে ব্যক্তি দিবা-রাতে ১২ রাকাআত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্যে জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন"।

* যহরের পূর্বে ঃ চার রাকাআত পরে দুই রাকাআত।
* মগরিবের পরে ঃ দুই রাকাআত।
* ইশার পরে ঃ দুই রাকাআত
* ফজরের পূর্বে দুই রাকাআত। [তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদ নং ৩০২]

অন্য এক বর্ণনায় যহরের পূর্বে দুই রাকাআত পড়ারও বর্ণনা এসেছে। তাই কোন কোন সময় যহরের পূর্বে দুই রাকাআত পড়া যায়।[বুখারী, নং ৯৩৭]

তাহাজ্জুদের নামায

তাহাজ্জুদ অর্থঃ রাতে ঘুম থেকে জেগে নামায আদায় করা। [ফাতহুলবারী, ৩/৬]
নবীজী বলেনঃ "ফরয নামায ব্যতীত সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের নামায"।
[মুসলিম, অধ্যায়ঃ রোযা, অনুচ্ছেদঃ মহররমের রোযার ফযীলত]

তাহাজ্জুদের নামায দুই দুই রাকাআত করে পড়তে হয়। প্রতি দুই রাকাআত শেষে সালাম ফিরাতে হয়। [বুখারী, জুমআহ, হাদীস নং ৯৯০]

নবীজী হতে তাহাজ্জুদ নামাযের সর্বাধিক রাকাআত সংখ্যা (১৩) প্রমাণিত, যাতে পাঁচ রাকাআত বিতর হত। [মুসলিম, সালাতুল মুসাফেরীন, রাতের নামায]

সাধারনতঃ তিনি (সাঃ) বিতর সহ ১১ রাকাআত পড়তেন।
[মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাতুল মুসাফেরীন, অনুচ্ছেদঃ রাতের নামায, নং ১৭২০]

সর্বনিম্ন বিতর সহ সাত রাকাআতের প্রমাণ পাওয়া যায়।[শারহে মুসলিম,৫/২৬২]

কারণে ছয় রাকাআতের কমও পড়া যেতে পারে। [ফিকহুস সুন্নাহ, ১/১৫২]

* **তাহাজ্জুদের সময়ঃ-** এশার নামাযের পর হতে ফযরের নামাযের পূর্ব সময় পর্যন্ত। তবে রাতের শেষ তৃতিয়াংশে পড়া উত্তম। [শারহে মুসলিম, ৫/২৭৭]

খচ্চরের কারনে শাস্তি

বাদশাহ আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান একদা তাঁর ছেলে হিশামকে জুমআর নামাযে অনুপস্থিত পায় .. নামায শেষে এক ব্যক্তিতে তার নিকটে পাঠানো হয় ..অনুপস্থিতির কারণ কি ? তা জানতে।

হেশাম বলেঃ খচ্চরের কারণে.. খচ্চর অসুস্থ .. আর অন্য কোন বাহন ছিলনা যাতে চেপে নামায পড়তে যেতে পারতাম.. সে যুগে ঘড়া এবং খচ্চর মানুষের যাতায়েতের সুন্দর বাহন মনে করা হত। বাদশাহ খবর পায়.. হেশামকে বলেঃ আচ্ছা তাহলে তুমি যদি নামায পড়তে যাওয়ার জন্য বাহন না পাও তাহলে, জুমআই পড়বে না ! কসম খেয়ে বলছিঃ এক বছর যাবত তোমার কোন বাহনে চড়া নিষেধ.. এটা তোমার শাস্তি !

আছেন কি কোন পিতা যিনি তার ছেলেকে নামাযে উপস্থিত না হওয়ার কারণে বলবেনঃ এক বছর পর্যন্ত তোমার সাইকেলে ..মটরসাইকেলে চাপা নিষেধ .. এটা তোমার নামাযে অনুপস্থিত থাকার শস্তি !! [.. ইল্লা লিইয়া'বুদূন, পৃঃ ৩০]

বিত্‌রের নামায

বিত্‌র শব্দের অর্থ বেজোড়। এই বেজোড় নামায ইশা কিংবা তারাবীহ কিংবা তাহাজ্জুদের পর ফজরের পূর্বে পড়তে হয়। [তিরমিযী , বিতর]

বিত্‌রের নামায এমন এক নামায যা তাগীদের সাথে নবীজী আদায় করতেন। তবে তিনি তা উম্মতের প্রতি জরূরী করেন নি। আলী (রাযিঃ) বলেনঃ " ফরয নামাযের ন্যায় বিত্‌র জরূরী নয়, তবে ইহা সুন্নত, নবীজী সুন্নত করেছেন।" [তিরমিযী, অধ্যায়ঃ বিত্‌র, অনুচ্ছেদঃ বিত্‌র জরূরী নয়]

বিত্‌রের রাকাআত সংখ্যাঃ হাদীসে বিত্‌রের রাকাআত সংখ্যা ১, ৩, ৫, ৭, এবং ৯য় পর্যন্ত পাওয়া যায়। [মুসলিম, সালাতুল মুসাফেরীন, রাতের নামায সম্পর্কীও অনুচ্ছেদ, ইবনু মাজাহ]

উল্লেখ্য যে, বিত্‌রের রাকাআত সংখ্যা কেবল তিন এমত এবং মন্তব্য প্রচুর সহীহ হাদীসের বিপরীত। নবীজী বলেনঃ " বিত্‌র হচ্ছে এক রাকাআত, শেষ রাতে "। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরদের নামায এবং কসরের বর্ণনা]

তিনি (সাঃ) আরো বলেনঃ " সকাল হওয়ার আশংকা হলে এক রাকাআত দ্বারা বিত্‌র পড়ে নিবে" । [বুখারী, হাদীস নং ১১৩৭- মুসলিম]

 # এক রাকাআত বিত্‌র পড়ার নিয়মঃ অন্যান্য নামাযের মত তকবীরে তাহরীমা দিয়ে, কিরাআত, রুকূ, সাজদা শেষে তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে।

 # তিন রাকাআত বিত্‌র পড়ার নিয়মঃ একাধারে তিন রাকাআত নামায পড়তে হবে। দুই রাকাআত শেষে কোন প্রকার তাশাহ্‌হুদ (বৈঠক) হবে না। শুধু তৃতীয় রাকাআতে তাশাহ্‌হুদ পড়ে সালাম ফিরাতে হবে। [ইবনু মাজাহ, অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করণ এবং উহার সুন্নত। অনুচ্ছেদঃ তিন এবং পাঁচ রাকাআত দ্বারা বিত্‌র] তিন রাকাআত বিত্‌রের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই উত্তম পদ্ধতি। অনেকে দুই রাকাআত নামায পড়ে তাশাহ্‌হুদ করে সালাম ফিরিয়ে আবার আলাদা করে এক রাকাআত নামায পড়াকে জায়েয বলেছেন। [মুগনী-২/৫৮৮]

মাগরিবের মত দুই রাকাআত নামায পড়ে প্রথম বৈঠক দেওয়া অতঃপর উঠে তৃতীয় রাকাআত পূরণ করা, এরূপ বিত্‌র পড়ার নিষেধ এসেছে। নবীজী বলেনঃ " মগরিবের মত পড় না " ।[দ্বারাকুত্বনী-২/২৪,ফাতহুল্ বারী ২/৬২০]

উল্লেখ্য যে, অনেকে এরূপ বিত্‌র পড়ে থাকে এবং তৃতীয় রাকাআতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা পড়ার পর রুকূর পূর্বে তকবীর দিয়ে হাত উঠিয়ে দুআয়ে কুনূত পড়ে। দুআয়ে কুনূত পড়ার পূর্বে তকবীর দেয়ার কোন সহীহ হাদীস নেই। তাই ইহা বর্জনীয়।

 # পাঁচ এবং সাত রাকাআত বিত্‌র এর বেলায় শুধু শেষ রাকাআতে তাশাহ্‌হুদ দিতে হবে। [ইবনে মাজাহ, ইকামাতুস সালাহ ওয়াস সুন্নাহ ফীহা , মুসলিম, সালাতুল মুসাফেরীন ওয়া কাসরিহা]

 # নয় রাকাআত বিত্‌রের বেলায় অষ্টম রাকাআতে প্রথম বৈঠক হবে অতঃপর নবম রাকাআত পড়ে তাশাহ্‌হুদ শেষে সালাম ফিরাতে হবে।
[মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফেরীন]

দোআয়ে কুনূত

কুনূত দুই প্রকারেরঃ (১) বিত্‌রের কুনূত (২) মুসলিম উম্মতের উপর শত্রুর আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর কারণে কুনূত। দ্বিতীয় প্রকারের কুনূত,

যে কোন ফরয নামাযের রুকূর পরে করা যায়। যদি বর্ণিত কারণ পরিলক্ষিত হয়। [আবুদাউদ, বিত্‌রের শাখা প্রশাখা অনুচ্ছেদ, নং১৪৩৭]

* প্রথম প্রকার অর্থাৎঃ বিত্‌রের নামাযের কুনূত সারা বছরে সবসময় জায়েয, তবে জরুরী নয়। অর্থাৎ ঃ কখনো কখনো কুনূত ছাড়াই বিত্‌র পড়া যায়।

* বিত্‌র নামাযের কুনূত রুকূর পূর্বে ও পরে উভয় সময়েই জায়েয।

[আবুদাউদ, ঐ, হাদীস নং ১৪২২- তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪৬০]

দোআয়ে কুনূত-উচ্চারণ ও অনুবাদঃ

" আল্লাহুম্মাহ্ দেনী ফীমান হাদাইত, ওয়া আ-ফেনী ফীমান্ আ-ফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়ত, ওয়া বা-রেক্‌লী ফীমা আ'ত্বাইত, ওয়া কেনী শার্‌রা মা-কাযাইত, ফাইন্নাকা তাক্ যী ওয়ালা- ইউক্‌যা আলাইক, ওয়া ইন্নাহু লা-ইয়াযিল্লু মাওঁ ওয়ালাইত, ওয়ালা ইয়া ইয্‌যু মান্ আদাইত, তাবা-রাক্‌তা রাব্বানা- ওয়া তাআ-লাইত, ওয়া নাস্তাগ্ ফিরুকা ওয়া নাতূবু ইলাইক, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান্নবী"।

অর্থঃ- " হে আল্লাহ ! তুমি যাদেরকে হেদায়েত করেছো, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো, তুমি যাদেরকে নিরাপদে রেখেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো আমাকে তাদের দলভুক্ত করো, তুমি আমাকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছো তা হতে আমাকে রক্ষা করো, কারণ তুমিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করো, তোমার উপরে তো কেহ ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই, তুমি যাহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো সে কোন দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছো সে কোন দিন সম্মানিত হতে পারে না, হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি বরকতময় ও সর্বোচ্চ। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাওবা করছি এবং বর্ষিত হউক নবীজীর প্রতি দরূদ- রহমত"।

[তিরমিযী, অধ্যায়ঃ বিত্‌র হাঃ নং ৪৬৩, আবুদাউদ, বিত্‌রের শাখা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ বিত্‌রের কুনূত]

****

মানিক মিঞা

মদীনায় সেটা ছিল আমার প্রথম বছর .. এক সংস্থার মাধ্যমে আমরা এক গাড়ী হজ্জ যাত্রী .. হজ্জে রওয়ানা দিলাম .. বিভিন্ন দেশের লোক.. তন্মধ্যে আমি একা এক বাংগালী। সফরকালে পরিচিত হলাম আর এক বাংলাদেশী, মানিক মিঞার সাথে। এটা কিন্তু ওর নতুন নাম..পুরাতন নাম অন্য.. আমি আসলে তার আগের নামটি ভুলে গেছি .. সে তার নাম পরিবর্তনের ঘটনা শুনায়.. আমিও আপনাদের সে ঘটনা শোনাতে চাই।

মানিক মিঞা বলেঃ আমিও সউদীতে নতুন.. হাসপাতালে ক্লিনারের কাজ করি.. ভাগ্যক্রমে কর্মস্থান নির্ধারিত হয় মদীনা শরীফে.. শুক্রবারের দিনটি ছাড়া সব দিন কাজে ব্যস্ত.. আমি দেখছিলাম আমার কাজের বন্ধুরা প্রতি শুক্রবারে ১০টার দিকে.. গোসল করে.. সবচেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে.. অনেকে আতর..পারফিউম লাগায়.. খুশি খুশি কোথায় যেন দলে দলে যায় .. বিকালে ক্যাম্পে ফিরে আসে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করিঃ তোমরা এ দিনে কোথায় যাও ? তারা বলে হারাম শরীফে.. 'হারাম শরীফ' ! আমি কথাটির অর্থ বুঝিনা.. তারা বুঝিয়েও দেয় না..আমি বলিঃ আমিও যেতে চাই। তারা কেমন যেন চমকে উঠে.. বলেঃ না ! তোমারে নেওয়া যাইত না। আমি আবার প্রশ্ন করি কেন ? তারা অস্পষ্ট উত্তর দেয়.. ভাল করে কারণ কেউই বলতে চায় না.. অনেক তর্ক-বিতর্কের পর একজন বলেই দিলঃ তুমি কাফের.. অমুসলিম.. অপবিত্র.. তাই। এ বিশ্রী কথাগুলি আমার অন্তরকে দারুন ভাবে আঘাত করে..আমি নিশ্চুপ হয়ে যাই .. কিন্তু মনে মনে বলিঃ তোমরা আমাকে যাই বল.. সাথে নাইবা নাও.. আমি কিন্তু হারামে যামু ।

এক দিন তাদের চোখ এড়িয়ে .. টেক্সি যোগে হারামস্থলে পৌঁছালাম .. লোকদের দেখি হারামে প্রবেশের আগে অযু করে ..আমিও অযু করে হারাম শরীফে প্রবেশ করি.. পরে জানতে পারলাম, হারামই হচ্ছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজ হাতে নির্মিত মসজিদ.. মসজিদে নববী। আমি সেন্ডেল দুটি এক হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে .. ভয়ে ভয়ে.. এক পা .. দুই পা

.. করে এগাতে থাকি। আমাকে কেউ নিষেধ করলো না.. তুমি অপবিত্র এও বলল না.। কে জানে, আমার বন্ধুরা যে আমাকে কেন এমন বলছিল ..।
আমি নামাযে আসা লোকদের চেহারা দেখি .. প্রবেশকারীদের দেখি.. কি উজ্জল তাদের মুখমন্ডল ! কত পরিষ্কার তাদের জামা কাপড় ! অনুমান করি, এরা মার্সেডিজ.. বি.এম.ডাব্লু ওয়ালা ধনি লোক..। আমি মনে মনে বলিঃ এসব বিত্তশালীদের আমরা খিদমত করি .. এদের পার্শে দাঁড়ালে নিজেকে খুব.. খুব.. ছোট মনে হয় .. কিন্তু আমি অবলকন করছিলামঃ আজ এসময়ে বাংগালি ক্লিনার .. ইন্ডিয়ান কর্মচারী .. শ্রীলংকী ড্রাইভার ..সব এক অপরের কাছাকাছি .. শরীর ঘেষে লাইনে বসে আছে .. কেউই একথা বলছে না .. একটু সরে দুরে বস ..দৃশ্যগুলি আমার মনে নাড়া দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আযান হয়। উহ ! কি দারুন ' আল্লাহু আক্ বারের ধ্বনি ' .. কথায় বুঝাতে পারব না.. যেন অন্তরের কলুষতা .. আবর্জনা .. আযানের এক একটি বাক্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুছে যাচ্ছিল। অতঃপর ওয়ায হয়.. আরবীতে.. বুঝতে পারি না .. অতঃপর নামায হয় ..কয়েক লক্ষ মানুষ এক সাথে নামায পড়ে .. আমিও তাদের সাথে পড়ি ..নামায শেষে ক্যাম্পে ফিরি .. সাথীদের বলিঃ আমি হারামে গিয়েছিলাম ..তারা আঁতকে উঠে .. কিছু বলার আগেই বলিঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই ! তারা আমাকে জড়িয়ে ধরে .. আমি বলিঃ কিন্তু একটি শর্ত ! আমি ঐ হারামের ইমাম সাহেবের হাতে মুসলমান হমু .. আমাকে ইমাম সাহেবের নিকট নিয়ে আসা হয় .. কলেমা পড়ানো হয়.. মানিক মিঞা .. এ নামটি কেন জানি আমারে খুব সুন্দর লাগতো .. আমি বলিঃ আমার নাম রাখুনঃ মানিক মিঞা .. তারা সম্মতি জানায় !!

মানিক মিঞা .. মানিক খোঁজে পায় .. যা, সাত রাজার ধনের চেয়ে উত্তম .. আর তা হল : ইমানের মানিক.. ইসলামের মানিক .. কিন্তু বংশ পরম্পরায় আমরা মুসলমানের সন্তানেরা কি কখনো মানিক খোঁজবো ? খোঁজ করতে কি কোন মসজিদে যাবো ? আশা করি যাবেন .. দোআও কারি।

জুমআর নামায

জুমআর নামায একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নামায। এর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে মুসলিম ব্যক্তি সমবেত হয়ে একত্রে নামায আদায় করে খতীবের খুতবা শ্রবণ করার বিশেষ সুযোগ পায়। এমনি ভাবে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে জানতে এবং সচেতন থাকতে এ নামায সহায়তা করে।

*** জুমআর নামায চার প্রকার লোক ছাড়া প্রত্যেকের প্রতি ফরয।** আল্লাহ বলেনঃ (হে মুমিনগণ ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্যে আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্বরণে ধাবিত হও এবং ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ কর) [জুমআহ/৯] নবীজী (সাঃ) বলেনঃ " আমার ইচ্ছা হয় যে, কোন এক ব্যক্তিকে জুমআর নামায পড়ার আদেশ দিই অতঃপর নিজে গিয়ে সে সমস্ত লোকদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিই যারা জুমআর নামাযে উপস্থিত হয় না" ।[মুসলিম/১৪৮৩]

*** যাদের প্রতি জুমআর নামায জরুরী নয় তারা হলঃ** ক- মহিলা। খ- দাস-দাসী। গ- মুসাফির। ঘ- অসুস্থ। [আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ দাস এবং মহিলাদের জন্যে জুমআর নামায] এরকম লোকেরা জুমআয় শরীক না হলে যহরের নামায পড়বে।

*** গোসলঃ** জুমআর দিনে গোসল করে নামায পড়া উত্তম মুস্তাহাব কাজ। [শারহে মুসলিম-৬/৩৭২]

*** জুমআর পূর্বে নফল নামায ঃ** জুমআর পূর্বে নির্ধারিত কোন নফল নামায নেই। সময় হিসাবে ইচ্ছানুযায়ী যত রাকাআত সম্ভব পড়া যায়। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ জুমআহ, হাদীস নং ১৯৮৪] তবে কমপক্ষে দুই রাকাআত " তাহিয়্যাতুল মসজিদ " পড়া অতি উত্তম। [বুখারী, অধ্যায়ঃ নামায, নং ৪৪৪]

*** জুমআর খুত্বাঃ** জুমআর নামাযের পূর্বে দুটি খুত্বা হবে। দুই খুত্বার মাঝে খতীবকে একটু বিশ্রামের বৈঠক করতে হবে। নবীজী (সাঃ) এর খুতবায়; আল্লাহ তাআলার প্রশংসা থাকত, কুরআন মজীদের কিছু তিলাওয়াত হত, ওয়ায উপদেশ থাকত এবং শেষে দোআ বিশিষ্ট বাক্য হত। তিনি (সাঃ) খুতবায়ে মাসনূনা দ্বারা খুতবা শুরু করতেন। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ জুমআহ, অনুচ্ছেদঃ দুই খুতবার বর্ণনা। শারহে মুসলিম-৬/৩৮৮] উল্লেখ্য যে, খুতবার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে ওয়ায-নসীহত যা

খুত্ববার আসল উদ্দেশ্য যদি তাহা আরবী ভাষায় হয়, তাহলে অআরবী ভাষী লোক বুঝতে পারবে না। সে কারণে উহা স্থানীয় ভাষায় হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। কারণ নবীগণ নিজ ভাষায় তাঁদের উম্মতদের শিক্ষা দিতেন। আর উম্মতে মুহাম্মদীর উলামাগণ নবীগণের উত্তরাধীকার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাছাড়া পুরো খুতবা আরবীতে জরূরী করে দেওয়ার কারণে এক তৃতীয় খুতবা আবিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎঃ প্রথমে বাংলা বা স্থানীয় ভাষায় আলোচনা, তার পর আযান দিয়ে আরবী ভাষায় দুই খুত্ববা। আযানের পূর্বে এই স্থানীয় ভাষার খুতবা অবশ্যই একটি নতুন সৃষ্ট আমল যা বর্জনীয়।

খুত্ববার সময় মসজিদে প্রবেশকারীর নামাযঃ ইমাম সাহেবের খুত্ববা প্রদান করার সময় কোন ব্যক্তি মসজিদে আসলে তাকে আগে সংক্ষিপ্ত দুই রাকাআত নামায পড়তে হবে অতঃপর খুত্ববা শুনতে হবে। যেমন নবীজী সুলাইক আল্ গাত্বাফানী নামক এক সাহাবীকে এরূপ করতে বলেন। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ জুমআহ, অনুচ্ছেদঃ খুত্ববার সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া। হাদীস নং ২০২১]

এমন মন্তব্য ঠিক নয় যে, খুত্ববা শুনা ওয়াজিব তাই নামায না পড়ে খুত্ববা শুনতে হবে ; কারণ ওয়াজিব হলে নবীজী স্বয়ং সেই সাহাবীকে নামায পড়ার আদেশ দিতেন না।

খুত্ববা শোনার গুরুত্ব ঃ ইমামের খুত্ববা গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতে হবে। এসময় কোন প্রকার কথা-বার্তা বলা যাবে না। কেউ বললে তাকে 'চুপ কর' একথাও বলা ঠিক নয়। [বুখারী, জুমআহ, নং ৯৩৪]

জুমআহ শেষে নফল নামাযঃ জুমআর নামায শেষে চার রাকাআত নফল নামায পড়া উত্তম। দুই রাকাআতও পড়া যায়। [মুসলিম, জুমআহ, অধ্যায়ঃ জুমআর পরে নামায- নাসাঈ, জুমআহ, অনুচ্ছেদঃ জুমআর পর ইমামের নামায।]

বিদ্রঃ জুমআর নামাযের পর ' আখেরী যোহরে'র নিয়তে চার রাকাআত নামায পড়ার কোন ভিত্তি নেই।

০০০০০০০০০০

শুনে আসছি শুধু ..

গত রাতে জালসার আয়োজন ছিল তাই গ্রামে প্রায় সবার বাড়িতে আত্নীয়-স্বজনে ভর্তি। সকালে নাস্তার সময় এক বোন তার ভাইকে প্রশ্ন করে ঃ মাওলানার কথাগুলি কি তোমার বিশ্বাস হয় ? এ ভাই জেনারেল শিক্ষিত.. জালসা উপলক্ষ্যে বাড়িতে এসেছিল.. আর যেই মাওলানার আলোচনার দিকে বোন ইশারা করছিল, তিনি রাতে আখেরাতের সম্পর্কে আলোচনা রাখেন। মৃত্যু.. মৃত্যুর পরে কবরে পুনরায় জীবিত করণ.. ফেরেস্তার প্রশ্ন পর্ব .. তোমার রাব্ব কে ? তোমার দ্বীন কি ? তোমার নবী কে ? অতঃপর কিয়ামতের দিনে.. শেষ দিনে.. সমস্ত মানুষের পুনরুত্থান.. আল্লাহর নিকট নেকী-বদীর হিসাব প্রদাণ .. বক্তা এসব বিষয়ে আলোচনা করেন। এসব কল্পনা.. কেচ্ছা কাহিনি.. না অন্য কিছু ? সেই মুসলিমা বোনের নিকট এসব সত্য মনে হচ্ছিল না .. তাই ভাইকে প্রশ্ন করে .. সত্যায়িত করার উদ্দেশ্যে কিংবা তার মতামত জানার উদ্দেশ্যে.. ভাই উত্তরে ঠোঁট বিচকিয়ে বলেঃ **কে জানে। এসব শুনে আসছি শুধু ..আমার সন্দেহ হয় !!**

প্রিয়/প্রিয়া পাঠক/পাঠিকা বৃন্দ ! এই ভাই মুখে স্পষ্ট বলে দিল যে তার সন্দেহ হয়..আপনিও বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আপনারও কি সন্দেহ হয় ? না দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন ? আপনি ছাড়া আপনার বন্ধুরা .. প্রতিবেশীরা .. সহচররা .. তাদের কথা বার্তায় কি আপনি এসব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষ্য করেন .. না সন্দেহ লক্ষ্য করেন ? এ ভাই মুখ ফুটিয়ে বলেছে মাত্র .. নচেৎ তিক্ত সত্য এই যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ নবীন মুসলিম প্রজন্মের অবস্থা এরূপ .. মুখে সে নাই বা বলুক।

আমি সন্দেহবাদী এই প্রজন্মের কাছে আন্তরিকতার সাথে কয়েকটি কথা রাখতে চাই .. আশা করি তারা চিন্তা করবেন .. কারণ তারা সৎ চিন্তাবাদীও বটে। পৃথিবীর মধ্যে আছে মধ্যাকর্ষণ শক্তি .. তাই মানুষ ও জীব জন্তু এখানে বসবাস করে.. ছিটকে পড়ে না। ইহা স্যার নিউটন বলেছেন। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহরা পরিভ্রমণ করছে ..। পৃথিবীর চাইতে সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড় ..।

পৃথিবী আকর্ষিক ভাবে সৃষ্টি হয়েছে.. বানর থেকে মানুষ এসেছে.. ইত্যাদি .. ইত্যাদি। এসব থিউরী ভুল না সঠিক আমি এ কথা বলতে চাচ্ছি না .. আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলঃ এসব থিউরী কোন এক ব্যক্তি আবিষ্কার করেছেন .. কোন এক ব্যক্তি বলেছেন .. তাই আমরা বিশ্বাস করি .. পড়াশুনা করি .. এর বিপরীত কেউ কিছু বললে আমরা তর্ক-বিতর্ক করি .. মোট কথা আমরা মানি !! এখন আমার প্রশ্ন হলঃ যদি আমরা এসব ব্যক্তি বর্গের সূত্র..থিউরী .. মানতে পারি.. বিশ্বাস করতে পারি তাহলে, সমস্ত ব্যক্তিবর্গ তথা সারা বিশ্বের মালিক, মহান আল্লাহর কথা কেন মানতে পারি না ? কেন সন্দেহ করি ? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবী .. সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব যাঁর জীবনে সামান্যতম দোষ পরিলক্ষিত হয়নি .. এরকম মহামানব নবী মুহাম্মদ (সাঃ) যখন কবরের .. কিয়ামতের .. বিচারের .. জান্নাত জাহান্নামের কথা বলেন তখন, আমরা কেন সন্দেহবাদী ..? কেন সন্দেহ পোষনকারী ..? জবাব দেবেন কি ?

জানাযার নামায

ইসলাম একটি পূর্ণ এবং সুন্দর ধর্ম। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর পূর্ণ বর্ণনা এই সুন্দর ধর্মে সুন্দর ভাবে দেওয়া হয়েছে। সেই সুন্দর বিধি-বিধানের মধ্যে একটি হচ্ছে জানাযার বিধান। মাইয়্যেতকে প্রথমে গোসল দান তার পর ভাল কাপড়ে কফন পরিধান অতঃপর জানাযার নামাযের মাধ্যমে মাইয়্যেতের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করণ। এসব এই ধর্মের সৌন্দর্যতা এবং সত্যতা প্রমাণ করে যা, অন্য ধর্মে দেখা যায় না।

মাইয়্যেতকে গোসল দানঃ মৃত ব্যক্তিকে আড়ালে গোসল দেয়ার ব্যবস্থা করা ভাল। পরনের কাপড় খুলে, লজ্জাস্থান অন্য কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে, সাধারণ পানি দ্বারা গোসল দিতে হবে। ময়লা পরিষ্কারে সহায়ক যেমন কুলের পাতা বা অন্য কৃত্রিম দ্রব্য পানিতে মিশ্রণ করা যায় অনুরূপ গোসলের সময় সাবান ব্যবহার করা যায়।

- প্রথমে স্বাভাবিক অযুর ন্যায় অযু দিতে হবে।
- অতঃপর প্রথমে ডান কাঁত পরে বাম কাঁত ধৌত করতে হবে।

- কম করে হলে একবার সারা শরীর ধুয়ে দিতে হবে। তবে তিনবার বা পাঁচবার বা সাতবার অর্থাৎ , বেজোড় গোসল দেওয়া উত্তম।
- শেষ বারের পানিতে কফূর বা সুগন্ধ মিশ্রণ করা ভাল।
  [বুখারী, অধ্যায়ঃ জানায়েয, হাদীস নং ১২৫৩]
- লজ্জাস্থান ধোয়ার সময় হাতে কোন কাপড় পেঁচিয়ে নেওয়া ভাল। কারণ অন্যের লজ্জাস্থান স্পর্শ করা হারাম। [ফিকহুস্ সুন্নাহ, ১/৩৭৮]
- স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারে। নবীজী মা আয়েশাকে বলেনঃ " যদি তুমি আমার পূর্বে মারা যাও তাহলে, আমি তোমাকে গোসল দিব"। [ইবনু মাজাহ, অধ্যায়ঃ জানায়েয, আহমদ]
- নিকটাত্মীয় বা গোসলের সুন্নতী নিয়ম জানেন এমন লোক যেন মাইয়্যেতকে গোসল দেয়।

কফনের বর্ণনা ঃ-

- উত্তম হল, মাইয়্যেতকে সাদা কাপড়ে কফন দেয়া ।[তিরমিযী, জানায়েয]
- কফনের কাপড় সাধারণ হওয়া বাঞ্ছনীয়, না খুব মূল্যবান আর না অচল সস্তা। [আহ্ কামুল জানায়েয, আলবানী, পৃঃ ৮৪-৮৫]
- কারণ বসতঃ শুধু একটি কাপড় দ্বারা কফন দেওয়া জায়েয। যেমন নবীজী, মুসআব এবং হামযাহ (রাযিঃ) কে দেন। [বুখারী, নং ১২৭৬..]
- উত্তম হলঃ পুরুষ মাইয়্যেতকে তিনটি কাপড়ে কফন দেওয়া যাতে, কামীস (কুর্তা) এবং পাগড়ী হবে না বরং তিনটিই চাদর স্বরূপ কাপড় হবে। আয়েশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ " নবী (সাঃ) কে তিনটি খাঁটি সুতি, ইয়েমেন দেশের তৈরী কাপড়ে কফন দেওয়া হয়। যাতে কুর্তা ছিলনা এবং পাগড়ীও ছিল না"। [বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, হাদীস নং ১২৬৪]

পদ্ধতি হবেঃ মাইয়্যেতকে তিনটি চাদরের উপর শয়ন করিয়ে বাম পার্শের কাপড়ের কিনারা টেনে ডান দিকে ঝুলিয়ে দেয়া। তার পর ডান দিকের কাপড় বাম দিকে। অনুরূপ বাকী দুটি। [মুলাখ্ খাস আল্ ফিক্হী, ১/২১০]

উল্লেখ্য যে, পুরুষদের বিনা কামীসে কফন দেওয়া উত্তম পদ্ধতি। কামীস দেওয়া উত্তম নয়। [ফাত্হুল বারী-৩/১৭৮]

মহিলাদের কফনঃ- পুরুষদের মত মহিলাদিগকেও তিনটি কাপড়ে কফন দেওয়া যায়; যেমন নবীজীকে দেওয়া হয়েছিল। অনুরূপ পাঁচটি কাপড়েও কফন দেওয়া যায়। পাঁচটির মধ্যে একটিঃ লুঙ্গি, দ্বিতীয়টিঃ কুর্তা, তৃতীয়টিঃ উড়নি, চতুর্থ এবং পঞ্চমঃ দুটি খোল বিশিষ্ট কাপড়। [আবুদাউদ, জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের কফন, হাদীস নং ৩১৫৫। মুগনী-৩/৩৯১]

জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি

* মাইয়্যেত পুরুষ হলে ইমামকে তার মাথা বরাবর এবং মহিলা হলে মাঝ বরাবর দাঁড়াতে হবে। [বুখারী, হাদীস নং ১৩৩১-১৩৩২, আবুদাউদ, অধ্যায়ঃ জানাযা]
* নবীজী বেশিরভাগ জানাযার নামায চার তকবীরে পড়াতেন ।[বুখারীঃ নং ১৩৪] চার তকবীরের অধীকও প্রমাণিত আছে। [আহকামুল্ জানায়েয- পৃঃ ১৪১]
* প্রথম তকবীরের পর সূরা ফাতেহা সহ অন্য একটি সূরা পড়ুন। তালহা বিন আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ " আমি ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর পিছনে জানাযার নামায পড়ি, তিনি সূরা ফাতেহা সহ অন্য একটি সূরা পড়েন .... তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ যেন তোমরা জানতে পার যে ইহা সুন্নত"। [বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া ..]

উল্লেখ্য, প্রথম তকবীরের পর সূরা ফাতেহা না পড়ে শুধু সানা পড়ার কোন সহীহ স্পষ্ট দলীল নেই। [আহকামুল জানায়েয-পৃঃ ১৫২-১৫৩]

* অতঃপর দ্বিতীয় তকবীর দিয়ে দরূদ পড়তে হবে। [আহকামুল জানায়েয, পৃঃ১৫৫]
(দরূদের অর্থ ও উচ্চারণ দেখুন পৃঃ নঃ ৩৪)
* অতঃপর তৃতীয় তকবীর দিয়ে প্রমাণিত দোআসমূহ পড়তে হবে। কয়েকটি দুআর প্রমাণ এসেছে তন্মধ্যে, দুটি দোআর উচ্চারণ সহ অনুবাদ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

উচ্চারণ সহ প্রথম দোআঃ " আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলাহু ওয়ার হামহু, ওয়া আ-ফিহী ওয়াফু আন্হু, ওয়া আক্ রিম্ নুযুলাহু, ওয়া ওয়াস্সি মুদ্ খালাহু, ওয়াগ্ সিল্হু বিল মা-ই ওয়াস্ সালজি ওয়াল্ বারাদ, ওয়া নাক্ কিহি মিনাল্ খাত্বা-ইয়া কামা- নাক্কায়তাস্ সাওবাল্ আব্ ইয়াযা মিনাদ্দানাস, ওয়া আব্ দিল্ হু দা-রান্ খাইরান্ মিন্ দা-রিহি, ওয়া আহ্ লান খায়রান মিন্ আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরান মিন যাওজিহি, ওয়া আদ্ খিল্হুল জান্নাতা ওয়া আইয্হু

মিন আযা-বিল্ কাবরি, ওয়া মিন্ আযাবিন্ নার"।

অর্থঃ " হে আল্লাহ ! তুমি মাইয়্যেতকে মাফ করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে ক্ষমা করো, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো,তার বাসস্থান প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি, বরফ ওশিশির দ্বারা, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমন ভাবে পরিষ্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লা মুক্ত করা হয়। তাকে এই দুনিয়ার ঘরের বদলে উত্তম ঘর প্রদান করো, তার এই পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করো, ইহজগতের জোড়া হতে উত্তম জোড়া প্রদান করো, এবং তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হতে মুক্তি দাও"। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা]

উচ্চারণ সহ দ্বিতীয় দোআঃ " আল্লাহুম্মাগ্ ফির্ লি হাইয়েনা- ওয়া মাইয়েতেনা, ওয়া শা-হেদেনা- ওয়া গায়েবেনা- ওয়া ছাগীরেনা- ওয়া কাবীরেনা- ওয়া যাকারেনা- ওয়া উন্ সানা- আল্লাহুম্মা মান্ আহ্ ইয়ায়তাহু মিন্না- ফা আহ্ য়িহী আলাল্ ইসলাম, ওয়া মান্ তাওয়াফ্ ফায়তাহু মিন্না ফা তাওয়াফ্ ফাহু আলাল্ ঈমান, আল্লাহুম্মা লা- তাহ্ রিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফ্ তিন্না বাদাহু"।

অনুবাদঃ- " আল্লাহ ! আমাদের জীবিত ও মৃতএবং (জানাযায়) উপস্থিত-অনুপস্থিত আমাদের ছোট ও বড়, পুরুষ ও নারী সকলকে আপনি ক্ষমা করুন। যাকে আপনি জীবিত রাখবেন, তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে আপনি মৃত্যু দিতে চান তাকে ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুদান করুন। হে আল্লাহ ! এই মাইয়েতের ভাল প্রতিদান হতে আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং উহার পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন না"। [আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মাইয়েতের জন্য দোআ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।]

* বর্ণিত দুটি দুআই এক সাথে পড়া যায়। কমপক্ষে একটি পড়ুন।

* মাইয়েত যদি শিশু হয় তাহলে অন্যান্য দোআ শেষে পড়ুনঃ

" আল্লাহুম্মাজ্ আল্হু লানা- সালাফা, ওয়া ফারাত্বাঁও ওয়া যুখরা, ওয়া আজ্রা"। **অনুবাদঃ** হে আল্লাহ ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরষ্কার হিসাবে গণ্য করুন"।
[আহ্কামুল জানায়েয-পৃঃ ১৬০-১৬১]

দফন শেষে দোআঃ নবীজী দফন শেষে মাইয়েতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। মাইয়েত যেন ফেরেস্তাদের প্রশ্নে দৃঢ় থেকে উত্তর দিতে পারে সে জন্য নবীজী নিজে দোআ করতেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকেও ইহার আদেশ দিতেন। তবে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে সবকে নিয়ে এক সাথে দোআ করতেন না। তাই এ সময় সবাইকে নিজে নিজে দোআ করতে হবে। ইমাম দোআ করাবে অতঃপর তার সাথে সবাই করবে এমন নয়। [আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ মাইয়েতের উদ্দেশ্যে, কবরের নিকট হতে ফিরার সময় ক্ষমা চাওয়া। আহ্‌কামুল জানাইয, পৃঃ ১৯৮]

ফিরে যাও .. পুনরায় নামায পড় ..

একদা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথিদের সাথে মসজিদে ছিলেন.. এক লোক মসজিদে প্রবেশ করে এবং নামায পড়ে .. নবীজী তার নামায পর্যবেক্ষণ করেন.. সে নামায শেষ করে নবীজীর নিকট আসে.. সালাম দেয় .. নবীজী সালামের উত্তর দেন এবং তাকে বলেনঃ ফেরত যাও.. পুনরায় নামায পড় .. তোমার নামায হয়নি। সে ফিরে গিয়ে প্রথম নামাযের ন্যায় আবার নামায পড়ে .. পুনরায় নবীজীর কাছে আসে এবং সালাম দেয়.. নবীজী সালামের উত্তর দিয়ে বলেনঃ আবার যাও.. নামায পড় .. তুমি নামায পড়নি। লোকটি বলেঃ তার শপথ যিনি আপনাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন..এর চেয়ে উত্তম নামায আমি পড়তে জানি না.. আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন.. কি ভাবে সম্পাদন করতে হয় ? এবার নবীজী তাকে নামায শেখান। বলেনঃ " যখন নামাযে দাঁড়াবে, তকবীর বলবে .. অতঃপর কুরআন হতে পাঠ করবে যা, তোমার নিকট সহজ .. অতঃপর রুকূ করবে এবং রুকূতে নিশ্চিন্ত হবে .. তারপর ভালভাবে বরাবর হয়ে দাঁড়াবে .. তারপর শান্ত হয়ে সিজদা করবে .. অতঃপর সিজদা হতে উঠবে এবং শান্ত হবে .. অতঃপর পুরো নামাযে অনুরূপ করবে .."। [বুখারী,মুসলিম]

আশ্চার্য ! আজ কত নামাযীকেই না নামায পড়ার পর ইহা বলার অতীব প্রয়োজন আছে যে, " ফিরে যাও.. পুনরায় নামায পড় .. তোমার নামায

হয়নি''..? কেউ তো রুকূ থেকে উঠাই ভুলে গেছে .. আর কেউ এক সাজদাকে দুটি সাজদা বানিয়েছে ,.. সাজদা থেকে উঠে বসার পূর্বেই .. মাঝ থেকেই দ্বিতীয় সাজদা ..! যেন রেডীম্যাড নামায !!।

দুই ঈদের নামায

ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মতকে দেওয়া দুটি আনন্দ উৎসবের দিন।

ঈদের নামাযের বিধানঃ দুই ঈদের নামায একটি ওয়াজেব পর্যায়ের নামায। নবী (সাঃ) নিয়মিত এই নামায আদায় করেন এবং পুরুষ ও মহিলা সাহাবী-সাহাবিয়াদের নামাযে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন। [বুখারী, জুমআহ, নং ৯৮১]

* নবীজী দুই ঈদের নামায সূর্য উঠার সামান্য পরেই পড়তেন যা, চাশ্‌তের নামাযের সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে যেত। অর্থাৎ ঃ বলা যেতে পারে যে, সূর্য গাছ বরাবর হওয়াটা দুই ঈদের নামায পড়ার সুন্নতী সময়। [আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ ঈদের নামাযে বের হওয়ার সময়।] বর্তমানে দেশে উভয় নামাযকে দেরীতে পড়ার পক্ষে কি দলীল ইমাম সাহেবগণই বলতে পারেন।

* উভয় নামায ময়দানে-ঈদগাহে আদায় করা মুস্তাহাব। [বুখারী, নং ৯৫৬]

* বিশেষ অসুবিধার কারণে মসজিদে আদায় করা যায়।[আবু দাউদ, সালাত]

সম্পাদন পদ্ধতি ঃ ঈদাঈনের নামাযের পূর্বে না আযান আছে না ইকামত। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুই ঈদের নামায।]

* দুই ঈদের নামাযের রাকাআত সংখ্যা দুই। এর আগে ও পরে কোন নফল নামায নেই। [বুখারী, নং ৯৮৯]

* তকবীরে তাহরীমা দ্বারা প্রথম রাকাআত শুরু করুন। অতঃপর সানা পড়ুন। অতঃপর সাতটি তকবীর দিন। প্রত্যেক তকবীরের সাথে সাথে দুই হাত কাঁধ বা কান বরাবর উঠান। সাত তকবীর শেষে সূরা ফাতেহা সহ অন্য একটি সূরা পড়ুন। তার পর প্রথম রাকাআতের বাকি কাজ সম্পন্ন করে দ্বিতীয় রাকাআতের শুরুতে পাঁচটি তকবীর দিন। অতঃপর সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা পাঠ করে বাকি কাজ সম্পন্ন করে সালাম ফিরান।

* তকবীরের এই পদ্ধতি খলীফা আবু বকর, উমর, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ এবং ইমাম বুখারী সহ প্রচুর সাহাবী ও তাবেয়ীগণ গ্রহণ করেন এবং আমল করেন। [তিরমিযী, ঈদাঈন, অনুচ্ছেদঃ দুই ঈদে তকবীর, নং ৫৩৪, তুহফাতুল আহ্ ওয়াযী- ৩/৬৫-৭১]

বর্তমানে মক্কা-মদীনা সহ সারা সউদী আরবে এভাবে ঈদাঈনের নামায আদায় করা হয়। অর্থাৎঃ প্রথম রাকাআতে সাত তকবীর আর দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচ তকবীর। মোট ১২ তকবীর।

* নামায শেষে ইমাম সাহেব খুতবা প্রদান করবেন। জনসাধারণ এই খুতবা শোনা এবং না শোনার স্বাধীনতা রাখে। [আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ খুতবা শোনার উদ্দেশ্যে বসা।]

ooooooooooooo

পরিশিষ্ট

(১) ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া প্রসঙ্গ

সত্যান্বেষী ভাইয়েরা ! নামাযে পাঠিতব্য সূরা-দোআসমূহের মধ্যে সূরা ফাতেহার (আল্‌হামদু সূরার) গুরুত্ব সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, নামাযী একা একা নামায পড়লে তাকে অবশ্যই সূরা ফাতেহা পড়তে হবে। কিন্তু যদি নামাযী ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ে তাহলে তাকে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে কি হবে না ? এ বিষয়ে প্রধান তিনটি মত লক্ষ্য করা যায়।

ক- সর্বাবস্থায় নামাযীকে সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে। সে একা একাই নামায পড়ুক বা ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ুক। সশব্দিক নামায হোক বা নিঃশব্দিক।

খ- ইমামের পিছনে মুক্তাদীকে কোন সূরাই পাঠ করতে হবে না। শুধু চুপ থেকে ইমামের তেলাওয়াত শুনবে।

গ- জেহরী নামাযে (শব্দ বিশিষ্ট নামাযে) ইমামের পিছনে পড়তে হবে না কিন্তু সির্‌রী নামাযে (নিরব নামাযে) পড়তে হবে।

এক্ষনে আমাদের সাধারণ লোকদের কর্তব্য হবে যে, যে মতের পক্ষে অধিক শুদ্ধ, স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ দলীল বিদ্যমান সে মতের অনুসরণ করা এবং পরম্পরায় করে আসা বা শুনে শুনে করে আসা আমলকে কুরআন ও হাদীসের মুকাবিলায় প্রাধান্য না দেওয়া। নিম্নে ত্বমতের দলীলাদির বর্ণনা দেয়া হলঃ-

ক– ইমামের পিছনেও সূরা ফাতেহা পড়তে হবে, এ মতের দলীলাদিঃ–

১ নং দলীলঃ নবীজী (সাঃ) বলেনঃ " তার নামায সহীহ হয় না যে সূরা ফাতেহা পড়ে না"। [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমাম মুক্তাদী সকলের প্রতি কিরআত জরূরী। হাদীস নং ৭৫৬/ মুসলিম]

প্রমাণিত হয়ঃ- সূরা ফাতেহা ছাড়া কোন নামাযই হয় না। উহা ফরয হোক বা সুন্নত। একা একা পড়া হোক বা ইমামের সাথে পড়া হোক।

২ নং দলীলঃ- আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেনঃ " যে ব্যক্তি

কোন নামায পড়ল এবং তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতেহা) পড়ল না, সেই নামায অসম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ অপূর্ণাঙ্গ"। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহা পড়া ওয়াজেব। হাদীস নং ৮৭৬]

প্রমাণিত হয়ঃ সূরা ফাতেহা বিহীন নামায অপূর্ণাঙ্গ। সে নামায ইমামের সাথে পড়া হোক বা একাকী আদায় করা হোক।

প্রকাশ থাকে যে, অসম্পূর্ণ কথাটি নবীজী তাগীদের সাথে তিন বার বলেন। যার আরবী শব্দটি হচ্ছে, "খিদাজ"। খিদাজ অর্থঃ সময়ের পূর্বে গর্ভচ্যুত বাচ্চা। [শারহে মুসলিম, ৪/৩২২] তাই নামাযের ক্ষেত্রে এর অর্থ এরকম নিলে সঙ্গত হবে যে, সূরা ফাতেহা বিহীন নামায অর্থাৎ ঃ নামায পূর্ণ হওয়ার আগে নষ্ট হওয়া।

৩ নং দলীলঃ- সাহাবী উবাদাহ বিন সামেত বলেনঃ একদা আমরা নবী (সাঃ) এর পিছনে নামায পড়তেছিলাম। এসময় মুক্তাদীদের মধ্যে কেউ সরবে কিছু পড়ে যার কারণে নবীজীর কিরআতে অসুবিধা হয়। নবীজী সালাম শেষে বলেনঃ " সম্ভতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পড়ে থাক ? আমরা বলিঃ হ্যাঁ! আল্লাহর রাসূল। অতঃপর নবীজী বলেনঃ "এরূপ করো না, সূরা ফাতেহা ব্যতীত; কারণ যে তা পড়ে না তার নামায হয় না"। [তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ ইমামের পিছনে কিরআত, নং ৩১০/ আবু দাউদ, নামায/ আহমদ / হাকেম।]

প্রমাণিত হয়ঃ- যে, মুক্তাদীগণকে শুধু সূরা ফাতেহা পড়তে হবে।

উল্লেখ থাকে যে, এই হাদীসটি সহীহ বা যয়ীফ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে তবে সিংহ ভাগ উলামা সহীহ (হাসান) বলেছেন। [দেখুন তুহফাতুল আহওয়াযী, ২য় খন্ড ১৯৩-১৯৫- হাশিয়া ফিকহুল হাদীস, ১/৩৮৬]

* ইমাম তিরমিযী বলেনঃ নবীজীর অধিকাংশ সাহাবী এবং তাবেয়ীন ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়ার এই হাদীসের প্রতি আমল করেন। [তিরমিযী, সালাত, অনুচ্ছেদ নংঃ ২২৯ হাদীস নং ৩১০]

৪ নং দলীলঃ- বিশিষ্ট সাহাবী আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ আমরা ইমামের পিছনে থাকি, এ সময় কি ভাবে পড়ব ? " তিনি বলেনঃ চুপে চুপে পড়ে নিবে"। [মুসলিম, নামায, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকাআতে কিরআত জরূরী]

অনুরূপ ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ খুদরী এবং আনাস (রাযিঃ) ও বলেন। [ইবনে হিব্বান এবং ইমাম বায়হাকীর কিতাবুল কিরাআহ।]

* সাহাবী এবং তাবেয়ীনগণ ছাড়া ইমাম শাফেয়ী, ইমাম বুখারী, ইবনুল মুবারক প্রমুখ এ মতই ব্যক্ত করেন। ইমাম বুখারী (রাহেঃ) বিশেষ করে এ বিষয়ে " জুয্ উল কিরাআহ খালফাল্ ইমাম " নামক বই রচনা করেন। ইমাম বায়হাকীও লেখেন। সাহেবে তুহফা, মুহাদ্দেস আব্দুর রহমান মুবারকপুরী প্রায় ৩৫০ পৃঃ বিশিষ্ট " তাহ্ কীকুল্ কালাম ফী অজূবিল্ কিরাআতে খাল্ ফাল্ ইমাম " নামক বিস্তারিত গবেষণামূলক বই লেখেন।

খ– ইমামের পিছনে কোন নামাযেই না সূরা ফাতেহা পড়া যাবে আর না অন্য কোন সূরা। এ মতের দলীলাদিঃ–

১ নং দলীলঃ- আল্লাহ তাআলা বলেনঃ অর্থঃ (যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক।) [আরাফ/২০৪]
বুঝা যায়, কুরআন পড়ার সময় চুপ থাকতে হবে। তাই নামাযে ইমাম যখন সূরা ফাতেহা বা অন্য সূরা পাঠ করবেন, তখন চুপ থাকতে হবে। কারণ উহা অবশ্যই কুরআন।

পর্যালোচনা = (ক) এই আয়াতের মর্ম যদি এই হয় যে, ইমামের পিছনে কিছু পড়া যাবে না বরং শুধু শুনতে হবে তাহলে, নবীজী ঐ হাদীস সমূহ কেন বললেন যেখানে বলা হয়েছেঃ " সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায হয় না"। নবীজী কি তাহলে এই আয়াতের বরখেলাফ আদেশ দেন (নাউযু বিল্লাহ)। হয়তঃ কেউ বলবেনঃ সূরা ফাতেহা পড়ার সম্পর্কে যে সব হাদীস এসেছে সেগুলি কুরআনের এই নির্দেশের পূর্বেকার আদেশ। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন সূরা ফাতেহা পড়ার বিধান রহিত (মানসূখ) হয়ে যায়। এ দাবী ঠিক নয় কারণ সূরা "আরাফ" যাতে এ আয়াত বিদ্যমান উহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর সূরা ফাতেহা পড়ার বিধানগুলি মদীনায় দেওয়া হয় যা, দ্বারা বুঝা যায় নবীজীর কথাগুলি আগের নয় বরং পরের। আর আগের বিধান দ্বারা পরের বিধান রহিত হয়না ইহাই ইসলামী পন্ডিতগণের সর্বমত।
(খ) যদি কেউ চুপে চুপে ইমামের পড়ার পরে পরে সূরা ফাতেহা পড়ে বা ইমাম সাহেব যখন এক একটি আয়াতের শেষে থামেন তখন পড়ে তাহলে শোনাও হয় এবং পড়াও হয়। শোনতে কোন অসুবিধা হয় না।

(গ) যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এই আয়াত ইমামের পিছনে নিরব থেকে শোনার অকাট্য দলীল তাহলে, যে সব নামাযে সশব্দে কিরআত নেই -যেমন যোহর ও আসরের নামায- সে সব নামাযে মুক্তাদী কি শুনবেন ? তাই এ আয়াত না পড়ার দলীল মেনে নিলেও আংশিক দলীল হয়, পূর্ণ দলীল হয় না।

২ নং দলীলঃ- নবীজী বলেনঃ " যখন তোমরা নামায পড়বে, লাইন সোজা করে নেবে। তোমাদের মধ্যে কেউ একজন ইমামতি করবে। তিনি যখন তকবীর দিবেন তোমরাও দেবে। আর যখন তিনি পাঠ করবেন তখন তোমরা চুপ থাকবে"। [মুসলিম, নামায, অনুচ্ছেদঃ নামাযে তাশাহ্ হুদের বর্ণনা। আবু দাউদ, নাসাঈ]

বর্ণিত হাদীসে, ইমামের কিরআত কালে চুপ থাকার আদেশ এসেছে। তাই যখন ইমাম ফাতেহা পড়বেন তখন মুক্তাদীদের চুপ থাকতে হবে।

পর্যালোচনা=(ক) এখানে চুপ থাকতে হবে অর্থ এটা নয় যে, কিছুই পড়তে হবে না, বরং চুপ থেকে মনে মনে সূরা ফাতেহা পড়ে নিতে হবে। যেমনটি আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) বুঝেছেন। কারণ আবু দাউদ ও নাসাঈতে বর্ণিত এই হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু হুরাইরাহ নিজেই। আর তিনি চুপে চুপে পড়তে বলেন। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, হাদীস নং ৮৭৬]

(খ) হাদীসে বর্ণিত " ওয়া ইযা কারাআ ফাআনসেতূ" অর্থাৎ ঃ যখন তিনি পাঠ করবেন তখন তোমরা চুপ থাকবে। এই বাক্যটিকে প্রচুর উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দেসীনগণ যয়ীফ (গায়র মাহফূয) বলেছেন। যেমন ইমাম বুখারী, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবু দাউদ, আবু হাতেম, হাকেম, দ্বারা কুত্বনী, ইবনু খুযাইমা, হাফেয আবু আলী নীসাপূরী, বায়হাকী প্রমুখ। তাই ইহা দ্বারা না পড়ার দলীল ধরা সঠিক হবে না। [তাহকীকুল কালাম..২/৮৭]

৩ নং দলীলঃ- জাবের হতে বর্ণিত নবীজী বলেনঃ " যার ইমাম আছে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত বলে গণ্য"। [ইবনু মাজাহ]

পর্যালোচনাঃ- হাদীসটি নিত্যান্ত দুর্বল (যয়ীফ)। ইবনে হাজার বলেনঃ এই হাদীসটি সকল হাদীস বিদ্বানদের নিকট যয়ীফ (দুর্বল) বলে পরিচিত। [ফাতহুল বারী, ২/৩১৪] এই দুর্বল হাদীসটি সূরা ফাতেহা সহ অন্য সূরা না পড়ার দলীল হিসাবে মেনে নিলে, পড়ার পক্ষে যত অকাট্য সহীহ দলীল বর্ণিত

হয়েছে ঐ সবের প্রতি আমলের কি হবে ? একটি খুবই দুর্বল হাদীস কেমনে একাধিক সহীহ হাদীসের সমতুল্য হতে পারে ? সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও দুর্বল হাদীসের প্রতি আমলই বা কি ধরণের যুক্তি ? তাছাড়া এই যয়ীফ হাদীসটি কুরআনের নির্দেশেরও বিপরীত। আল্লাহ বলেনঃ (অতঃপর তোমরা পড় কুরআন থেকে যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ সাধ্য।)
[মুযাম্মিল/২০]

জেহরী নামাযে পড়তে হবে না কিন্তু সিররী নামাযে পড়তে হবে। এই মতের দলীলাদিঃ–

১ নং দলীলঃ- আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক জেহরী নামাযে সালাম শেষে নবীজী নামাযীদের জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই মাত্র আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছে ? এক ব্যক্তি বলেঃ হ্যাঁ! আল্লাহর রাসূল আমি পাঠ করেছি। নবী (সাঃ) বললেনঃ তাই তো, আমি বলছি কুরআন পাঠে আমার বিঘ্ন কেন সৃষ্টি হচ্ছে ? হাদীস বর্ণনা কারী বলেনঃ এর পর থেকে লোকেরা জেহরী সালাতে রাসূল (সাঃ) এর সাথে কিরআত করা থেকে বিরত হয়ে যায়। [আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদঃ নং ২৩০, হাদীস নং ৩১১]

পর্যালোচনাঃ-(ক) হাদীসটির বক্তব্য স্পষ্ট যে, পিছনে কেউ সশব্দে নবীজীর সাথে কুরআন পড়ছিল বলে তাঁর পড়তে অসুবিধা হচ্ছিল। ব্যাপারটি আপনিও অনুধাবন করতে পারেন। ইমামতির সময় আপনার পিছনে যদি কেউ আপনার সাথে সাথে সূরা ফাতেহা বা অন্য সূরা পড়ে তাহলে আপনার পড়ায় বিঘ্ন ঘটবে। এমনটাই হয়েছিল নবীজীর ক্ষেত্রে। তাই এরকম সরবে পড়তে নবীজী নিষেধ করেন কারণ ইহাতে ইমামের পড়তে অসুবিধা হয়। কিন্তু আস্তে-নিরবে পড়লে তো অসুবিধা বা বিঘ্ন সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না। অর্থাৎ ঃ হাদীসটি উচ্চৈঃস্বরে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়া নিষেধের প্রমাণ, নিরবে পড়া নিষেধের নয়। তাই চুপে চুপে পড়তে হবে যেমন আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন।

(খ) হাদীসের শেষ বাক্যঃ " এর পর থেকে লোকেরা জেহরী নামাযে রাসূল (সাঃ) এর সাথে কিরআত করা থেকে বিরত হয়ে যায়"। এই বাক্যটি

নবীজীর নয় বরং ইহা হাদীস বর্ণনাকারী তাবেয়ী যুহরীর তাই ইহা দ্বারা জেহরী কিরআতে না পড়ার দলীল ধরা সঠিক নয়।

[এ বিষয়ের বিস্তারিত প্রাঞ্জল আলোচনা দেখুন মুবারকপুরীর "তাহকীকুল কালাম ফী অজুবিল্ কিরাআতে খালফাল্ ইমাম" গ্রন্থে।]

লেখকের অভিমতঃ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের নিরপেক্ষ আলোচনার পর এ কথা স্পষ্ট যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায শুদ্ধ না হওয়া, অসম্পূর্ণ হওয়া বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার আশংকা থাকে। কিন্তু পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হয় এরকম কিছু পাওয়া যায়না সে কারণে পড়াই দলীল ও বিবেক সম্মত আমল হবে বলে আশা করি।

OOOOOOOOOOOOOOOO

(২) মুখে সশব্দে নিয়ত পড়া প্রসঙ্গ

নিয়তের অর্থঃ- নিয়ত আরবী শব্দ। এর বাংলা অর্থঃ ইচ্ছা করা, মনস্ত করা, এরাদা করা, সংকল্প করা। [মুনজিদ, ৮৪৯/ ফতহুল বারী,১/১৭] শব্দটি আমরা বাংলাভাষী লোকেরাও ব্যবহার করি। যেমন বলিঃ আমি এ বছর হজ্জ করার নিয়ত করেছি। অর্থাৎঃ ইচ্ছা করেছি মনস্থ করেছি।

নিয়তের গুরুত্বঃ শরীয়তে নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তির আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়না যতক্ষণে বান্দা তার নিয়ত সঠিক না করে নেয়। অর্থাৎ: আল্লাহর জন্যে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না করে নেয়। আল্লাহ বলেনঃ (তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ট ভাবে আল্লাহর এবাদত করবে ..) [বাইয়্যিনাহ/৫]

নবী (সাঃ) বলেনঃ" আমল সমূহ নিয়তের (ইচ্ছার) উপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে"। [বুখারী, প্রথম হাদীস]

হাদীসটিতে নবীজীর বক্তব্য স্পষ্ট যে, মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিজরত। হিজরত অর্থঃ ইসলামের বিধি-বিধান পূর্ণ রূপে পালন করতে পারা যায়না এমন দেশ ছেড়ে সে দেশে যাওয়া যেখানে বিনা অসুবিধায় পালন করা যায়। অন্য কথায়, কুফরের দেশ ত্যাগ করে ঈমানের দেশে প্রত্যাবর্তন করা। [ফাতহুল বারী, ১/২১] তাই কোন ব্যক্তি যদি এ কারণে দেশ ত্যাগ করে যে, সে যে দেশে যাচ্ছে সেখানে যাওয়ার তার উদ্দেশ্যে হল কোন রমণীকে বিবাহ করা বা দুনিয়াবী কোন সুবিধা অর্জন করা, তাহলে সে তাই পাবে। হিজরতের ফলে কোন নেকী পাবেনা। যদি সে ঈমান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হিজরত করতো, তাহলে নেকী পেত। কাজ একই কিন্তু নিয়তের পরিবর্তনের কারণে নেকী পাওয়া এবং না পওয়া নির্ভর করছে।

প্রকৃত নিয়ত হচ্ছে ঃ ইবনুল কাইয়ুম (রাহেঃ) বলেনঃ ' নিয়ত হচ্ছে, কোন কিছু করার ইচ্ছা করা এবং সংকল্প করা। উহার স্থান হচ্ছে অন্তর যবানের সাথে আসলে তার কোন সম্পর্ক নেই। এ কারণে না তো নবীজী হতে আর না কোন সাহাবী হতে নিয়তের শব্দ বর্ণিত হয়েছে'। [ইগাসাতুল্ লাহ্ফান, ১/২১৪]

সত্য প্রিয় ভাই ! হ্যাঁ ! প্রকৃতপক্ষে নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর মুখে বলা বা পড়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ, ধরুন আপনার গ্রামে মসজিদ উন্নতি কল্পে জালসা হচ্ছে। আপনি জালসায় আগত আলেমদের আলোচনা শোনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন। সাথে এক শত টাকাও নিলেন। সভা শেষে ১০০ টাকা দান করে বাড়ি ফিরলেন। বলুন তো, আপনি যে এ নেকীর কাজটি করলেন এর জন্য কি আপনাকে মুখে আরবী বা বাংলায় এরূপ বলতে হল যে, হে আল্লাহ ! আমাদের গ্রামে মসজিদের উন্নতি কল্পে আয়োজিত জালসায়, আগত উলামাদের আলোচনা শোনার উদ্দেশ্যে এবং এক শত টাকা দান করার উদ্দেশ্যে জালসা শুনতে উপস্থিত হলাম বা হতে যাচ্ছি ? যদি কেউ এরূপ বলে তাহলে অনেকে তাকে মাথা খারাপ বলে মন্তব্য করবে। নামাযের লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু অজান্তে আল্লাহকে আরবীতে তাই বলে যাচ্ছি। বলছিঃ হে আল্লাহ ! অমুকের পিছনে অমুক নামায পড়তে, কিবলামুখী হয়ে উপস্থিত হয়েছি। নামাযী যখন নামাযের

উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করে সেটাই নামাযের নিয়ত হয়। অতঃপর যখন সে যহর, আসর বা মাগরিবের নামায সম্পাদনের জন্য দাঁড়ায় তখন সেটাই তার উক্ত নামাযের নিয়ত হয়। অনুরূপ সুন্নত, নফল, ১, ২, ৩, বা চার রাকাআত পড়ার তার অন্তরে যে ইচ্ছা জাগে সেটাই নিয়ত। মুখে শব্দ দ্বারা কোন কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

আরবী বা বাংলায় বিশেষ শব্দ দ্বারা নিয়ত পড়া ঃ- পূর্বের আলোচনা হতে সুস্পষ্ট যে নিয়তের জন্য আরবী বা বাংলায় কিছু বলতে হয় না। তবুও অনেকে আরবীতে এরূপ নিয়ত পড়ে থাকে যেমন ফজর নামাযের নিয়ত কালে বলেঃ ' না ওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লা-হে তাআলা রাকাআতাই সালাতিল ফাজরে ফারযুল্লাহে তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতে- আল্লাহু আকবার'। নিম্নে বিষয়টির সঠিকতা বিশ্লেষণার্থে সহীহ্ দলীল ভিত্তিক আরো কিছু আলোচনা করার প্রয়াস করা হলঃ-

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা ! নামায তথা অযু, রোযা, যাকাত, দান-খয়রাত কোন ক্ষেত্রেই প্রিয় নবী (সাঃ) এরকম শব্দ পড়ে নিয়ত করেন নি। কোন সাহাবী বা তাবেয়ী আর না চার ইমামদের কেউ এরকম নিয়ত পড়তেন। তাই যে আমল নবীজী কিংবা সালাফে সালেহীন দ্বারা প্রমাণিত নয় সে আমল অবশ্যই একটি শরীয়তে আবিষ্কৃত নতুন আমল যা, বিদআত। নবী (সাঃ) বলেনঃ

" যে ব্যক্তি শরীয়তে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা, শরীয়তের অংশ নয় তা বর্জনীয়"। [মুসলিম]

নামাযের শুরু "তকবীরে তাহরীমা"। এর পূর্বে নিয়ত পড়া হয়। এখন বিষয়টির সত্যতা যাঁচাই করার জন্য প্রত্যেক নামাযী ভাইকে এতটুকুই অনুরোধ করব যে, নবীজীর নামাযের বর্ণনা প্রত্যেক হাদীসের বইতে বিস্তারিত এসেছে। যদি এধরণের নিয়ত হাদীসে থাকে তো যে কোন হাদীসের বই পড়ে দেখতে পারেন। অবশ্যই কোথাও পাবেন না। নিম্নে নামায শুরু করার সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে যা দ্বারা বুঝা যেতে পারে যে, আল্লাহু আকবার বলার পূর্বে মুখে নিয়ত পড়ার প্রমাণ আছে না নেই।

ইবনে উমার (রাযিঃ) বলেনঃ নবীজী যখন নামাযে দাঁড়াতেন ; তখন তিনি তাঁর হাত দুটি বাহু বরাবর উঠাতেন। অতঃপর তকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন। [মুসলিম, অধ্যায়ঃ নামায, অনুচ্ছেদ নং ৯ হাদীস নং ৮৬০-৮৬১]
হাদীসটি স্পষ্ট যে, তিনি (সাঃ) তকবীরের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন। নিয়ত পড়ে তকবীর দিতেন না।
নবী (সাঃ) নামায ভুলকারী জনৈক সাহাবীকে নামায শিক্ষা দেওয়ার সময় বলেনঃ " যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন তকবীর দিবে"। [বুখারী, নং৭৯৩]
এখানেও হাদীস স্পষ্ট যে, নামাযে দাঁড়ালে তকবীর দিয়ে নামায শুরু করতে হয়। কেউ যদি নিয়ত পড়ে শুরু করে তাহলে হাদীসের বরখেলাফ তো অবশ্যই হয়।
নবীজী আরো বলেনঃ " নামাযের চাবি পবিত্রতা অর্জন, (পার্থিব কাজ-কর্ম কথা-বার্তা ইত্যাদি) তকবীর বলার মাধ্যমে হারাম হয়, (আর সে সকল হালাল হয়) সালামের মাধ্যমে"। [তিরমিযী, অধ্যায় পবিত্রতা অর্জন, প্রথম হাদীস]
এ হাদীসে নামাযের শুরু এবং শেষ বর্ণিত হয়েছে। শুরু হচ্ছে তকবীরে তাহরীমা তথা আল্লাহু আকবার বলা। নিয়ত পড়া নয়।

উল্লেখ্য যে, কায়েদা বগদাদীতে নিয়ত লেখা আছে বলে কিছু অজ্ঞ লোক তাই দলীল মনে করে এবং আমল করে। এটি চরম ভুল। কায়েদা বগদাদী শরীয়তের কোন দলীলের বই নয়, উহা কেবল একটি আরবী বর্ণ পরিচয়ের বই। যেমন বাংলা বর্ণ পরিচয়ের জন্য শিশু শিক্ষা, বাল্য পাঠ বা অন্য কোন বই। শরীয়তের দলীল হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস।

মুখে উচ্চারণকৃত নিয়তের ক্ষতিকারক দিকসমূহঃ-

১- অনেক ভাইকে নামাযের কথা বললে, বলেঃ নিয়তই জানিনা নামায কিরূপে পড়ব। অর্থাৎ সে মনে করে আরবীতে তৈরী করা এসব নিয়ত মুখস্ত না করলে নামায হয় না। কি আশ্চার্য ! আবিস্কৃত বিদআতী কিছু শব্দ মানুষকে নামায থেকে দুরে সরায় !!

২- মকতব মাদ্রাসায় অনেক ছাত্রকে ডজনেরও অধিক আরবী নিয়ত মুখস্ত করানো হয়, অথচ দেখা যায় সে ছাত্রটি এখনও দু চারটি সূরা

মুখস্ত করে নি। বলুন তো, এ ক্ষেত্রে নিয়ত মুখস্ত করানো জরূরী না সূরা মুখস্ত করানো জরূরী ?

৩- যেহেতু নিয়তের প্রচলিত বাক্যগুলি আরবী ভাষায় আর আমরা আরবী বুঝি না। অন্যদিকে নামাযের রাকাআত সংখ্যা ভিন্ন, অনুরূপ নামাযও বিভিন্ন। যেমন ফরয, সুন্নত এবং নফল। আর নিয়তে বর্ণিত থাকে এই সব ব্যাপার। তাই নিয়তের শব্দসমূহে সামান্য পার্থক্য থাকে। এবার মুখস্ত করার সময় এবং নামাযের পূর্বে পড়ার সময় অনেকের গোলমাল বেঁধে যায়, ফলে এই সমস্যায় পড়ে কেউ মাদ্রাসার পড়া ছাড়ে আর অনেকে রাকাআত ছড়ে। অর্থাৎঃ নামাযী মসজিদে ঢুকে দেখে যে, ইমাম সাহেব সূরা ফাতেহা পড়ার পর অন্য ছোট সূরা পড়তে শুরু করেছে, তখন সে তাড়াতাড়ি নিয়ত পড়তে গিয়ে গোলমালে পড়ে। দেখা যায় ইমাম সাহেব রুকূতে চলে গেছেন আর সে হাত খাড়া করে নিয়তের গোলমাল ঠিক করতে ব্যস্ত। আর অনেক সময় নিয়ত পড়তে গিয়ে সূরা ফাতেহা না পড়ে রুকূতে শামিল হয়। সূরা ফাতেহা যা পড়ার শক্ত নির্দেশ এসেছে সে তা পড়তে অনিচ্ছুক কিন্তু তৈরীকৃত নিয়ত পড়তে এ অবুঝ খুবই সচেতন ? খুবই আগ্রহী ?

(৩) ফরয নামায শেষে সম্মিলিত দোআ প্রসঙ্গ

একজন প্রকৃত নামাযী ভাইর কর্তব্য হবে যে, সে জানবে নবীজী কিভাবে নামায সম্পাদন করতেন, কি ভাবে তাশাহ্হুদ করতেন, কি ভাবে সালাম ফিরাতেন। অনুরূপ সালাম ফিরানোর পর কি করতেন। তিনি যেমন করেছেন তেমনই আমাদের করতে হবে। নবীজী বলেনঃ " তোমরা নামায আদায় কর, যে ভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখছ"। [বুখারী]

নবীজীর নিয়মের বাইরে কোন কিছু দেখা গেলে, সে কাজটি কি আপনি তবুও করবেন ? একজন আলেম যদি সাধারণ মানুষের নামাযে ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করেন তহলে কি তাঁকে চুপ থাকা দরকার ? আর সে যদি সেই ভুলটি

জনসাধারণকে ধরিয়ে দেয়, তাহলে জনসাধারণদের কি তাঁর সম্পর্কে কটুক্তি করা তথা মন্দ বলা উচিৎ হবে ?

দোআর সম্পর্কে একস্থানে আলোচনা শেষ হয়েছে এমন সময় এক ব্যক্তি রাগান্বিত জোর কণ্ঠে হুশিয়ারী দিয়ে আলেমকে বললঃ দোআ করা কি অপরাধ ? না জায়েয ? আর একজন শক্ত মন্তব্য এ বলে পেশ করলঃ এর পূর্বে যারা দোআ করতেন তারা কি জানতেন না যে, এভাবে দোআ করা ঠিক নয় ? অন্য দিক থেকে এদের চেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে একজনের কণ্ঠ ভেসে আসলোঃ এরা দোআ উঠিয়ে দিল কিছু দিন পর নামাজও তুলে দিবে।

সমস্ত অভিযোগের দিকে লক্ষ্য দিলে জানতে পারবেন। সবাই সম্মিলিত দোআ অস্বীকারকারীকে অপদস্ত করার উদ্দেশ্যে আক্রোশমূলক কথা বলেছে মাত্র। ভাই এটা শরীয়ত। নিজ নিজ বিবেকে যেটা ভাল মনে হয়, সুবিধার মনে হয়, এখানে তার কোন স্থান নেই। এখানে তাঁর কথার মর্যাদা হবে যে, কুরআন কিংবা সহীহ হাদীস পেশ করে নিজের মতকে দৃঢ়তা প্রদান করবে।

প্রথম মন্তব্য দোআ করা কি অপরাধ ? দোআ তো ইবাদতের আসল। তাহলে দোআ করলে অসুবিধা কোথায় ?

প্রথমতঃ এই ভাইকে বলবঃ ভাই! আপনাকে জানতে হবে দোআ কাকে বলে? আপনি যদি মনে করে থাকেন যে, নামাযের পর সবাই হাত তুলে ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে যে আমলটি করে থাকে সেটাই দোআ, তাহলে এ ধারণা ভুল। দোআ অর্থঃ চাওয়া, প্রার্থনা করা, আল্লাহকে ডাকা। ইহা কেবল নামাযের পরের সাথে সম্পৃক্ত না বরং ইহা তো নামায এবং নামাযের বাইরে সবসময়ের জন্য প্রজোয্য। মনে করুন, আপনি অসুস্থ তাই বার বার মুখ দিয়ে বলছেনঃ আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দাও! ইহাকে দুআ বলা হয়; জরূরী নয় যে আরবীতে হতে হবে বা নামাযের পরে হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ দোআ করা অপরাধ নয় কিন্তু অপরাধ সেখানে যেখানে নবীর তরীকায় দোআ হয় না। যে স্থানে নবী সকলকে নিয়ে দোআ করেন নি, আপনি যদি সে স্থানে দোআ করা জরূরী মনে করেন কম করে হলে ভাল মনে করেন তাহলে, অপরাধ হওয়ারই কথা। যে কাজ যে সময় নবী ভাল মনে করেন নি সেটা আমি আপনি কেমনি ভাল বলি ?

যদি আপনি কিছু লোককে যহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকাআত নামায সম্মিলিত ভাবে পড়তে দেখে নিষেধ করেন। আর নামায আদায়কারীরা যদি বলেঃ নামায পড়া কি অপরাধ ? তাহলে তাদের মন্তব্য অবশ্যই ভুল। কারণ নামায পড়া অপরাধ নয় কিন্তু যহরের সুন্নত জামাআত করে পড়া অবশ্যই অপরাধ। অনুরূপ দোআ করা অপরাধ নয় কিন্তু এই সময় সম্মিলিত ভাবে দোআ করা অপরাধ বটে। প্রসঙ্গটির সম্পর্কে বিশিষ্ট তাবেয়ী সাঈদ বিন মুসাইয়েব (রাহেঃ) এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা ভাল মনে করছি। তিনি একদা এক ব্যক্তিকে ফজরের পর বার বার নামায পড়তে দেখে তাকে নিষেধ করেন। (কারণ নবীজী ফজরের নামাযের পর নফল নামায পড়তে নিষেধ করেছেন, যতক্ষনে না সূর্য উদয় হয়) সে ব্যক্তি তাবেয়ী সাঈদকে বলেঃ হে আবু মুহাম্মদ ! আল্লাহ কি আমাকে নামায পড়ার কারণে আযাব দিবে ? তাবেয়ী উত্তর দেনঃ না, কিন্তু সুন্নতের বরখেলাফ করার কারণে তোমাকে আল্লাহ আযাব দিবে"। [দারেমী, নং ৪৩৬, ইরওয়াউল গালীল, ২/২৩৬] আশা করি দোআকে ভাল বলবেন কিন্তু প্রচলিত এ পদ্ধতিকে ভাল বলবেন না।

দ্বিতীয় মন্তব্যঃ পূর্বের আলেমেরা কি এটা জানত না ? এরা কি বেশি জানে ? প্রশ্ন অনুযায়ী যদি প্রতিউত্তরে বলা হয়ঃ মক্কা এবং মদীনা শরীফের ইমাম-আলেমগণ বেশি জানেন না আপনারা ? তাহলে ইনসাফ প্রিয় ভাইয়েরা ইহাই বলবেন যে, সেখানকার আলেমেরা বেশি জানেন। কই তাহলে মক্কা মদীনায় তো লক্ষ লক্ষ নামাযীদের নিয়ে ইমাম সাহেবগণ প্রতি নামায শেষে দোআ করেন না। আপনারা কেন করছেন ?

কথা পূর্বের ও পরের না, কে বেশি জানে কে কম জানে তা না। কে সহীহ দলীল অনুযায়ী আমল করে তাই দেখার বিষয়। তাছাড়া যারা গত হয়ে গেছেন তাদের নিকট গিয়ে বুঝা-পড়া করার সম্ভাবনা তো আর নেই। যারা বর্তমানে আছেন তাদের সাথেই বুঝা পড়া করুন। যাঁরা না জেনে তা করে বিদায় নিয়েছেন, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন এটাই আশা করা দরকার। তাদের জন্য দুআও করা দরকার। সমস্যা সেখানে, যাদের বুঝিয়ে দেয়া সত্ত্বেও বুঝতে চায় না।

তৃতীয় মন্তব্যঃ এরা দোআ তুলে দিল কিছু দিন পর নামাযও তুলে দিবে। কোন ভাই ধরুন, বেগুন খায়না বলে যদি কেউ তার সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, এ বেগুন খায়না কিছু দিন পর ভাতও খাওয়া ছেড়ে দিবে। এ মন্তব্যের কোন আধার আছে কি ? নামায স্বয়ং আল্লাহ ফরয করেছেন এটা কোন সাধারণ আলেম তো দুরের কথা নবী-রাসূলগণও সামান্যতম অংশ রহিত করতে পারেন না। যেমন পূর্বে বলেছিঃ কেউ যদি মনে করে দোআ মানে নামাযের পর ইমাম সাহেবের হাত তুলে দোআ করা, তাহলে সে এরকম মন্তব্য করতেই পারে এবং ওরা করতে পারে যারা নামাযের বিষয়ে কোন হাদীসের বই অধ্যায়ন করে না, নামাযের শুরু কি এবং শেষ কি জানে না।

প্রচলিত এই দোআর কিছু সমস্যাঃ-

* সাধারণ মানুষ দোআ বলতে এই প্রচলিত দোআকেই মনে করে বসেছে যা, একে বারে ভুল। স্বয়ং নামাযের মধ্যে যত সব সুন্দর সুন্দর দোআ আছে তার গুরুত্বই দেয় না। মুখে শুধু উচ্চারণই করছে অর্থ জানতে চেষ্টা করে না।

* একটি বেদলীল কাজকে প্রমাণিত আমলের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎঃ প্রচলিত এই দোআ ইমাম না করলে জনসাধারণ মনে করছে আমার নামায হয়তঃ পূর্ণ হল না। তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি, বিবাদ এবং মন্দ মন্তব্যও করা হচ্ছে। আর যে আমলের অগণন প্রমাণ এসেছে অর্থাৎঃ সালাম শেষে "যিক্‌র আযকার" করা তা একে বারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, ইমাম সাহেবের সাথে দোআ করার জন্য অধীর অপেক্ষা হচ্ছে। শেষ হলেই উঠে সুন্নত পড়া হচ্ছে আর না হলে বেরিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

* মনে করা হচ্ছে ইমাম সাহেব কে দিয়েই দোআ করতে হয়। নিজেও যে দোআ করতে পারে তা প্রায় মানুষ ভুলে যাচ্ছে। অনুরূপ নিজে দোআ মুখস্ত না করে ইমামের উপর দিয়েই চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইমাম যেহেতু দোআ করেন সেহেতু আমার শেখার প্রয়োজন নেই।

* মনে করুন আপনি রোগ থেকে মুক্তি পেতে চান, কেউ চাকুরী চায়, কারো অর্থের প্রয়োজন, কেউ কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা করতে চায়, কেউ পারিবারিক সমস্যার সমাধান চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব অন্তরের কথা,

আমি তো নামায পড়তে চাই কিন্তু .. !

লেখক ঃ

আব্দুর রাকীব (মাদানী)
লিসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব

أريد أن أصلي ، و لكن .. !

تأليف: عبد الرقيب رضاء الكريم

সে উটের রাখাল.. বেদুইন .. তবে ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি সদা যত্নবান .. কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ তোমার আল্লাহ যে আছে তার প্রমাণ কি? সে উত্তরে কিছু না বলে পাশে পড়ে থাকা উটের একখন্ড মল (গোবর) হাতে তুলে নিয়ে প্রশ্নকারীকে বললোঃ এই গোবরের টুকরাটি প্রমাণ করে যে, উট আছে.. উট না থাকলে উটের লীদ কিভাবে হয়..। তাই এই মহা বিশ্ব এবং ইহার মাঝে বিদ্যমান অগণন জীব-জন্তু, পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী, গ্রহ-উপগ্রহ প্রমাণ করে যে, এ সবের কেউ সৃষ্টি কর্তা আছে। আর তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ.. আসুন না আমরা তাঁকে জানতে চেষ্টা করি.. কেবল তাঁরই ইবাদত করি..।

কয়েকটি ইসলামী পরিভাষা

* কেউ আপনার অবস্থা জানতে চাইলে যেমন, আপনি কেমন আছেন? খবর-সবর কি? তাহলে বলুনঃ "আল্ হাম্‌দু লিল্লাহ" অর্থঃ 'সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর'।

* ভবিষ্যতে কোন কিছু করার ইচ্ছা পোষন করলে যেমন, আগামী কাল যাব, বা আগামীতে করবো, তাহলে বলুনঃ "ইন্ শাআল্লাহ" অর্থঃ 'যদি আল্লাহ চান'।

* মুসলিম ভাইর মৃত্যুর খবর শুনলে বা কোন বিপদাপদ দেখলে বা নিজে বিপদগ্রস্থ হলে বা কোন কিছু হারিয়ে গেলে বলুনঃ "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন" অর্থঃ 'আমরা সবাই আল্লাহর জন্যে এবং আমাদের সবাইকে তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে'।

মতামত পাঠানোর ঠিকানা ঃ

Al-Uswah Al-Hasanah (Ideal) Library. Samsia mor.,Kushmandi, Dist. D/Dinajpur, W/B. INDIA.